বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.001

বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল : একটি সমীক্ষা

এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

১৫৭৬-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ মোগল বংশীয় শাসনামলে বাংলার বিভিন্ন রাজধানী শহর রাজমহল, ঢাকা এমনকি মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক অঞ্চলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসংখ্য ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছে। এসব পুরাকীর্তি মূলত দুটি প্রাচীন নির্মাণরীতির – একটি দেশজ প্রাক-মোগল সুলতানি স্থাপত্যরীতি এবং অপরটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম নির্মাণশৈলী সংশ্লেষণের ফসল। সংখ্যার বিচারে এসব ধর্মীয় ইমারতের এক বিরাট অংশই হলো মসজিদ, যে মসজিদ স্থাপত্য সর্বতোভাবে মুসলিম শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক। বাংলার মোগল মসজিদসমূহ যথাযথ স্থাপত্যিক অবয়ব ও দ্বিপ্তিময় অলংকরণ বিশেষত্বে গঠিত। এ যুগের মসজিদ স্থাপত্য ভূমি নকশা অনুযায়ী তিনটি ধারায় – বর্গাকার, আয়তাকার ও বারান্দাযুক্ত – বিকশিত। কিন্তু আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে বাংলার সুলতানি মসজিদের চিরাচরিত উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ ও দেশজ *চৌচালা* ছাদের পরিবর্তে মোগল বাংলার মসজিদসমূহে সর্বক্ষেত্রে কন্দাকৃতির গম্বুজ এবং ক্ষেত্র বিশেষে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ, সমতল ছাদ, নলাকৃতির খিলানছাদ ও *চৌচালা* খিলানছাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আর ছাদ নির্মাণ কৌশল হিসেবে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ, ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ ও স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মাঠ জরিপ ও লিখিত উৎস পর্যালোচনাপূর্বক রচিত আলোচ্য প্রবন্ধ মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

চাবি শব্দ: বাংলা, মোগল, মসজিদ স্থাপত্য, *চৌচালা*, নির্মাণ রীতি।

ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল বংশানুক্রমিক শাসনের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ জহিরউদ্দীন মুহাম্মদ বাবরের উত্তরাধিকারী পুত্র সম্রাট নাসিরউদ্দীন মুহাম্মদ হুমায়ূন প্রথম বাংলা বিজেতা (১৫৩৮) হিসেবে কৃতিত্বপূর্ণ গৌরবের অধিকারী হলেও মূলত ১৫৭৬ সাল বাংলার ইতিহাসে একটি যুগ পরিবর্তনকারী কাল।[১] উল্লিখিত সালে সম্রাট আকবরের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ মুনিম খান কর্তৃক রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের মধ্যদিয়ে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মোগলদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল মূলত সুবাদার মানসিংহের (১৫৯৪-১৬০৬) পথ ধরে ইসলাম খানের সুযোগ্য নেতৃত্বে (১৬০৮-১৬১৩)। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মোগলদের মাধ্যমে বহির্ভারতীয় ইউরো-আফ্রো-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে বাংলা প্রদেশের পরিচিতির

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পাশাপাশি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ন্যায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিশেষ করে স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে দৈশিক ও বৈশ্বিক নির্মাণরীতির মিশ্রণে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটে। বলা যায়, কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পাশাপাশি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনের মধ্য দিয়ে সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে যে ধারার উন্মেষ ঘটেছিল তা মোগল আমলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে এবং এক নতুন রীতির স্থাপত্যধারার উদ্ভব হয়। প্রসঙ্গত বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২) ও পাবনার চাটমোহর মসজিদের (১৫৮১-৮২) নামোল্লেখ করা যায়।[২] মসজিদ দুটিতে বাংলার সুলতানি স্থাপত্যের অনেক বৈশিষ্ট্য যেমন– উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ, অবস্থান্তর পর্যায়ে পান্দানতিফের ব্যবহার, বক্রাকার কার্নিশ পর্যন্ত উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, কৌণিক খিলানের প্রয়োগ, অবতল মিহরাব *কুলঙ্গি*, পোড়ামাটির অলংকরণ প্রভৃতি পরিদৃষ্ট হয়। তবে উভয় মসজিদের এক কক্ষবিশিষ্ট নামাজঘর তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত, যা বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে অভিনবত্বের সৃষ্টি করেছে।

উত্তর ভারতীয় মুসলিম নির্মাণ ঐতিহ্যের এ জনপ্রিয় রীতি (তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ) পরবর্তীকালে পরিমার্জিত আকারে সমগ্র মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। অর্থ্যাৎ বিবর্তনের মাধ্যমে এ বিশেষ রীতির মসজিদ নির্মাণধারা পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং আদর্শরূপে গৃহীত হয়। প্রসঙ্গত উত্তর ভারতে সম্রাট আকবরের লাল বেলে পাথর স্থাপত্য থেকে সম্রাট শাহজাহানের সাদা মর্মর প্রস্তর স্থাপত্যে রূপান্তর প্রক্রিয়ার ন্যায় বাংলাতেও প্রাক-মোগল সুলতানি স্থাপত্য ঐতিহ্য বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমেই উন্নত মোগল নির্মাণধারায় রূপান্তরিত হয়। তাই বলা যায় যে, বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্য দুটি প্রাচীন নির্মাণরীতির সংমিশ্রণের ফসল – একটি দৈশিক প্রভাবপুষ্ট সুলতানি স্থাপত্যধারা এবং অপরটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম রীতি বিশেষ করে রাজধানী শহর দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোরে বিকশিত ঐতিহ্যবাহী মোগল নির্মাণশৈলী। তবে সংগত কারণে বর্ণিত দুটি ধারার মধ্যে পরবর্তী রীতির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেননা মোগল বাংলার সুবাদার ও নবাব সকলেই উত্তর ভারতীয় মোগল শাসকদের অধীন প্রতিনিধি-কর্মচারী হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতেন এবং এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তাদের আত্মীয়-পরিজন। উল্লেখ্য যে, দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিয়োজিত বাংলার সুবাদার কিংবা নবাবদের মধ্যে কমবেশি সকলেই স্থাপত্যশিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কোনো কোনো সুবাদার-নবাব বিশেষ করে সুবাদার শাহ সুজা (১৬৩৯-৫৮), শায়েস্তা খান (১৬৬৩-৭৮ ও ১৬৭৯-৮৮) এবং নবাব মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-২৭) খ্যাতনামা নির্মাতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। এসব প্রশাসকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার বিভিন্ন রাজধানী শহর যেমন– রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ নগরাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মিত হয়েছে, যার কিছু কিছু উদাহরণ অদ্যাবধি টিকে রয়েছে। এসব পৃষ্ঠপোষক-নির্মাতার নিকট দেশীয় সংস্কৃতি পরিপুষ্ট সুলতানি

বাংলার স্থাপত্যরীতি ততটা চিত্তাকর্ষক ছিল বলে মনে হয় না। আর এ কারণেই মূলত দিল্লির রাজকীয় নির্মাণশৈলীর অনুকরণে এ দেশে ক্রমান্বয়ে এক নতুন স্থাপত্যধারার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। প্রসঙ্গত বাংলার উন্নত মোগল রীতির মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ সর্বদা সরু বুরুজ বেষ্টিত উদগ্রভাবে (prominent) নির্মিত, যা পারসিক প্রভাবান্বিত উত্তর ভারতীয় ইওয়ান-ই-প্রবেশপথের প্রাদেশিক সংস্করণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। তাছাড়া সংকীর্ণ গ্রীবা সংবলিত কন্দাকৃতির গম্বুজ, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান, কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, গোলায়িত পান্দানতিফ, শীর্ষদণ্ড ও ছত্রীর ব্যবহার, মুকার্নাস কারুকার্য, মার্লনযুক্ত সমান্তরাল বপ্র, অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব, পলেস্তারায় রচিত স্বল্প গভীর আয়তাকৃতির প্যানেল সজ্জা, বদ্ধ পত্র নকশা (*কানজুরা*) প্রভৃতি নতুন ধারায় নির্মিত এসব মোগল মসজিদের এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশলের দিক থেকে মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্য সুলতানি মসজিদের চিরাচরিত *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ ও দেশীয় *চৌচালা* খিলানছাদে আচ্ছাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

মধ্যযুগীয় বাংলায় ভূমি নকশা মূলত বর্গাকার, আয়তাকার ও বারান্দাযুক্ত মসজিদ স্থাপত্যের তিনটি ধারায় বিকশিত হয়েছে। আয়তাকার পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মাণরীতির অসংখ্য উদাহরণ বাংলাসহ উত্তর ভারত তথা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে বিদ্যমান। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ (১৩৭০), গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭৯) ও ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯১-১৫১৯), দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (১১৯৫) ও আড়াই দিনকা ঝোপড়া মসজিদ (১১৯৯), বহির্ভারতীয় দামেস্ক জামি মসজিদ (৭০৫-১৫), বাগদাদ জামি মসজিদ (৭৬২), সামাররা মসজিদ (৮৪৭), কায়রোর আল-হাকিমের মসজিদ (৯৯০-১০১৩) প্রভৃতি এ রীতির অনন্য উদাহরণ। উল্লেখ্য যে, মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে দামেস্ক জামি এক কক্ষবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের প্রাচীনতম উদাহরণ, যেটি দেবমন্দির (Temenos) ও অভ্যন্তরীণ গির্জার ভূমি নকশা দ্বারা প্রভাবিত বলেই অনুমিত হয়। আর বাংলাসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র সর্বযুগে সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট ছত্রী রীতির মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের মসজিদের অন্যতম উদাহরণ হলো খান জাহানের সমাধি সংলগ্ন মসজিদ (১৪৫৯), পনেরো শতকে নির্মিত রনবিজয়পুর মসজিদ ও সিংড়া মসজিদ, বিবির মসজিদ (১৬২৮), এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২), আল্লাকুরী মসজিদ (১৬৮০) প্রভৃতি। বলাবাহুল্য বর্গাকার পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মাণরীতির উৎস মুসলিম শিল্পকলার ইতিহাসে সমাধি স্থাপত্যের মধ্যে নিহিত। বাংলার স্থাপত্যে একলাখী সমাধি (১৪১৮-৩৩) ও বাগেরহাটের খান জাহানের সমাধি (১৪৫৯) একই শৈলীর দুটি বিদ্যমান নিদর্শন।[৩] বাংলার বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট এরূপ সমাধি সৌধ নির্মাণের ধারণা উত্তর ভারতীয় (ইলতুৎমিশের সমাধি) কিংবা তারও পূর্বে আব্বাসীয় আমলে নির্মিত (বোখারার ইসমাইল সামানীদের সমাধি ও হাযারা মসজিদ) অনুরূপ উদাহরণ থেকে গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। আবার ভারতীয় তথা মুসলিম স্থাপত্যে এক

গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির ইমারত নির্মাণের এ রীতি সম্ভবত সাসানীয় অগ্নিমন্দির *চাহারতাক*-এর ভূমি পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীর মধ্যেই প্রোথিত বলে ধারণা করা যায় এবং খ্রিষ্টীয় দুই শতকে নির্মিত নাইসার ও ফিরূজাবাদের ভগ্নমন্দির দুটি সাসানীয় অগ্নিমন্দিরের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৪] তাছাড়া বাংলার স্থাপত্যে বারান্দাযুক্ত এক ও ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের বেশ কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত পনেরো শতকে নির্মিত দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জ মসজিদ ও সুরা মসজিদ, গৌড়ের লট্টন মসজিদ ও খানিয়াদীঘি মসজিদ, বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ ও সিংদহ আউলিয়া মসজিদ এবং পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ি মসজিদ প্রভৃতি এ রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একইভাবে বহু গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদের সম্মুখেও বারান্দা সংযোজনের প্রমাণ মিলে, যার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ ও বড়সোনা মসজিদ। বারান্দাযুক্ত এক ও ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের এ ধারা পরবর্তীতে মোগল আমলে অনুসৃত হয়েছে। যেমন– টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ (১৬০৯) ও রংপুর জেলার ভাঙনী মসজিদ (আঠারো শতক)। এসব মসজিদের সম্মুখে বারান্দার সংযোজন গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর কিংবা মাটির ঘরবাড়ির সামনে সংযুক্ত বারান্দার হুবহু অনুকৃতি বলেই প্রতীয়মান।[৫] কেননা এতদঞ্চলের দারিদ্র্য-পীড়িত মানুষ আর্থিক সংগতি না থাকায় এ ধরনের বারান্দা সংবলিত খড়ের ছাউনিযুক্ত কুঁড়েঘর নির্মাণ করে বসবাস করত এবং দেশীয় বারান্দাযুক্ত কুঁড়েঘরের অনুকরণে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি রচনায় বাংলার কারিগরদের যে প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বারান্দাযুক্ত এক ও ততোধিক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের এ বাংলা-রীতি পরবর্তীকালে উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যে দিল্লি জামি ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদে অনুসৃত হতে দেখা যায়। এই উভয় মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে এগারো খিলানবিশিষ্ট একটি করে টানা বারান্দা সংযুক্ত রয়েছে।[৬]

ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশলের ওপর ভিত্তি করে মূলত মোগল বাংলার বর্গাকার মসজিদকে দুটি শ্রেণিতে যথা– এক গম্বুজ ও নয় গম্বুজ; আয়তাকার মসজিদকে চারটি ভাগে যেমন– তিন গম্বুজ, পাঁচ গম্বুজ, ছয় গম্বুজ ও দশ গম্বুজ; বারান্দাযুক্ত মসজিদকে একাধিক ভাগে– এক ও তিন গম্বুজ এবং বিবিধ রীতির মসজিদকে পাঁচটি ভাগে যথাক্রমে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ বিশিষ্ট, *চৌচালা* খিলানছাদ সংবলিত, সমতল ছাদ বিশিষ্ট, বাংলা রীতি ও নলাকৃতির খিলানছাদ বিশিষ্ট মসজিদ প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। ভূমি নকশা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিশেষ উল্লেখপূর্বক বাংলার মোগল মসজিদ স্থাপত্যের ছাদ নির্মাণরীতি ও কৌশল সম্পর্কিত একটি বৈশ্লেষিক সমীক্ষণ তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা মোগল বাংলার গৌরবোজ্জ্বল স্থাপত্যিক ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। তবে রীতিভিত্তিক মোগল মসজিদের আচ্ছাদন প্রকৃতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে নির্মাণ তারিখের কালানুক্রম রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

১ বর্গাকার মসজিদ

১.১ বর্গাকৃতির এক গম্বুজ মসজিদ

বিবির মসজিদ (ভূমি নকশা-১): ১০৩৮ হিজরি মোতাবেক ১৬২৮ সালে সৈয়দ আলী মোতওয়ালী কর্তৃক নির্মিত আলোচ্য মসজিদটি বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার খেরুয়া মসজিদ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।[৭] এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের প্রতিবাহুর পরিমিতি ৪.৫৭ মিটার। মসজিদের সমগ্র বহির্গাত্র পলেস্তারায় আচ্ছাদিত এবং প্রতি কোণে রয়েছে একটি করে কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো বর্তমানে বিলুপ্ত। একদা অবস্থান্তর পর্যায়ে ইটের তৈরি কর্বেল পান্দানতিফ সহযোগে তৈরি বিশাল আকৃতির গম্বুজ দ্বারা মসজিদটি আচ্ছাদিত ছিল। বক্রাকার কার্নিশযুক্ত আলোচ্য মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে তিনটি আক্কিক প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং কিবলা দেয়ালের তিনটি মিহরাব *কুলঙ্গি* বর্তমানে নতুন করে নির্মিত। আলোচ্য মসজিদের কার্নিশ সুলতানি বাংলার ঐতিহ্যবাহী রীতি বক্রাকারে রচিত এবং এটি মোগল বাংলার ইতিহাসে নতুন রীতির সূচনাকারী ইমারত হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। একই ধারায় নির্মিত মোগল বাংলার বর্গাকৃতির এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের অন্যান্য উদাহরণ হলো এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২) (আলোকচিত্র-১), গাজীপুরের সুলতানপুর মসজিদ (সতেরো শতক), ঢাকার হায়াত বেপারী মসজিদ (১৬৪৪), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুগড় মসজিদ (১৬৭৩), কিশোরগঞ্জের হরশী মসজিদ (১৬৭৫-৭৬), ঢাকার আল্লাকুরী মসজিদ (১৬৮০), কিশোরগঞ্জের গোরাই মসজিদ (আনু. ১৬৮০) ও শাহ মোহাম্মদ মসজিদ (সতেরো শতক), বাগেরহাটের চাকশ্রী মসজিদ (সতেরো শতক) ও চকরী মসজিদ (সতেরো শতক), সতেরো শতকে নির্মিত বরিশালের বাগমারা মসজিদ ও উত্তর-বাউরগাতী মসজিদ, নারায়গঞ্জের মোগরাপাড়া মসজিদ (১৭০০-০১), গোয়ালদি মসজিদ (১৭০৪) ও গরিবুল্লাহ মসজিদ (আঠারো শতক), বগুড়া জেলার ফররুখ শিয়ার মসজিদ (১৭১৮), আঠারো শতকে নির্মিত রাজশাহী রৈপাড়া মসজিদ, চুনারিপাড়া মসজিদ, সিরাজগঞ্জের বেরিপোটাল মসজিদ প্রভৃতি। এ সকল মসজিদ মূলত এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার পরিকিল্পনায় নির্মিত। প্রতিটি মসজিদের গম্বুজ অষ্টভুজাকৃতির কিংবা গোলায়িত অনুচ্চ পিপার ওপর সংস্থাপিত হলেও উপর্যুক্ত মসজিদসমূহের গম্বুজ নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ উল্লিখিত উদাহরণের প্রায় সকল মসজিদের গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ইটের তৈরি কর্বেল পান্দানতিফ পদ্ধতির প্রয়োগ দৃশ্যমান। তবে হায়াত ব্যাপারী মসজিদ, শাহ মোহাম্মদ মসজিদ, চাকশ্রী মসজিদ, চকরী মসজিদ, গরিবুল্লাহ মসজিদ, আল্লাকুরী মসজিদ ও বেরিপোটাল মসজিদের ছাদের ভার বহনে অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে সুলতানি রীতির অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আর ভাদুগড় মসজিদ ও গোয়ালদি মসজিদের গম্বুজ নির্মাণে একই সাথে অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান ও পান্দানতিফ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সর্বোপরি মোগরাপাড়া মসজিদ এক গম্বুজবিশিষ্ট হলেও আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত (৭.৭৭ $\times$ ৫.৩৩ মিটার) বিধায় ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করা

হয়েছে। মসজিদটি আচ্ছাদনের ক্ষেত্রে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল শীর্ষে দুটি অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ (half-domed vault) নির্মাণপূর্বক আয়তাকার কক্ষকে প্রথমে বর্গাকারে রূপান্তর করে তদুপরি চার কোণে পান্দানতিফ সহযোগে ভরাটপূর্বক একটি করে গম্বুজ স্থাপন করা হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যে এক গম্বুজবিশিষ্ট ছত্রী রীতির মসজিদের ছাদ নির্মাণে উল্লিখিত পদ্ধতি এক বিরল দৃষ্টান্ত।

মধ্যযুগীয় বাংলায় সুলতানি আমলে সর্বপ্রথম এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির মসজিদ নির্মাণের নজির পাওয়া যায় এবং ঢাকার বিনত বিবি মসজিদ (১৪৫৭) এ রীতির প্রাচীনতম বিদ্যমান উদাহরণ।[৮] আর একলাখী সমাধি নির্মাণের (১৪৩৩) মধ্যদিয়ে বাংলার স্থাপত্যে এরূপ এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত নির্মাণধারার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। আলোচ্য সমাধি মধ্যযুগীয় বাংলায় এক নতুন রীতির সূচনাকারী ইমারত হিসেবে পরিগণিত, যার মাধ্যমে সমগ্র সুলতানি আমলে এমনকি তৎপরবর্তী সময়ে অত্র এলাকায় এক স্বতন্ত্র রীতির আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরবর্তীকালে উল্লিখিত সমাধিকে ভিত্তি ধরে ঢাকার মসজিদের অনুকরণে সুলতানি বাংলায় অসংখ্য বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এ রীতির অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে বাগেরহাটের খান জাহানের সমাধি সংলগ্ন মসজিদ (১৪৫৯), পনেরো শতকে নির্মিত রনবিজয়পুর মসজিদ ও চুনাখোলা মসজিদ, হোসেনশাহী আমলে নির্মিত বারোবাজারের জোড়বাংলা মসজিদ, নূনগোলা মসজিদ, পাঠাগার মসজিদ ও চেরাগদানী মসজিদ, দিনাজপুরের রুকনখান মসজিদ (১৫১২), সোনারগাঁওয়ের গোয়ালদি মসজিদ (১৫১৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সুলতানি বাংলার এক গম্বুজ মসজিদের অনুকরণে পরবর্তীতে মোগল আমলে এক গম্বুজবিশিষ্ট অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়, উল্লিখিত মসজিদসমূহ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে গঠন বৈশিষ্ট্যের বিচারে এসব মোগল মসজিদ সুলতানি উদাহরণ থেকে অনেকাংশেই ভিন্নতর। এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার পরিকল্পনায় গঠিত ঢাকার আল্লাকুরী মসজিদের (১৬৮০) নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত চার আক্ষিক প্রক্ষিপ্ত অংশের কারণে আলোচ্য মসজিদ সুলতানি বাংলার এক গম্বুজ মসজিদ থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। বাংলার এক গম্বুজ বর্গাকার ইমারত নির্মাণের ধারণা উত্তর ভারত তথা পারসিক স্থাপত্যের (সামানীয় সমাধি) মধ্যে প্রোথিত হলেও মূলত প্রাক-মুসলিম সাসানীয় অগ্নিমন্দির *চাহারতাক* নির্মাণের মধ্য দিয়ে এর বীজ রোপিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বাংলার এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত ও সামানীয় সমাধির ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী অভিরূপ (উভয় গম্বুজাবৃত বর্গাকার) হলেও তারা দুটি ভিন্ন সভ্যতার প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত। মধ্য-এশিয়ার ইমারতে (সামানীয় সমাধি) উর্ধ্বাভিমুখী ক্রমহ্রাসমানতা, দেয়ালগাত্রের বিজড়িত ইষ্টক নকশা এবং চারটি আক্ষিক প্রবেশপথ বিদ্যমান। অপরদিকে বাংলার ইমারতে ইটের প্রশস্ত দেয়াল নির্মাণের ফলে বিশালত্বের ছাপ প্রস্ফুটিত এবং পোড়ামাটির ফলক নকশা নান্দনিকতার বিচারে অতুলনীয়। তাছাড়া বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনা, অবনমন দেয়ালগাত্র, আক্ষিক প্রবেশদ্বার ও স্কুইঞ্চ খিলান সহযোগে গম্বুজ নির্মাণ প্রভৃতি প্রাক-ইসলামি সাসানীয় নির্মাণরীতি বোখারার সমাধিতে

যথাযথভাবে প্রতিভাত হলেও আলোচ্য সৌধটি অধিক পরিমার্জিত ও পরিশীলিত এবং মুসলিম বিশ্বের একক ও অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

১.২ বর্গাকৃতির নয় গম্বুজ মসজিদ

লালদীঘি মসজিদ (ভূমি নকশা-২; আলোকচিত্র-২): পলেস্তারার আস্তরণে আবৃত ইটের তৈরি আলোচ্য মসজিদ গঠনশৈলী বিবেচনায় আঠারো শতকের মধ্যভাগে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।[৯] বর্গাকৃতির নয় গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের প্রতিবাহুর বহিস্থ পরিমাপ ৯.৫৪ মিটার এবং এর অভ্যন্তরভাগ দু-সারি স্তম্ভ দ্বারা নয়টি বর্গাকৃতির (১.৭১ মিটার) ইউনিটে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজগুলো আবার অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত। পিপার ভার বহনে অবস্থান্তর পর্যায়ে বাঙালি পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাব তুলনামূলকভাবে বড় এবং উদ্‌গত পরিকল্পনায় রচিত। এর চারকোণায় রয়েছে চারটি বুরুজ, যেগুলো মসজিদের সমান্তরাল কার্নিশ ছেড়ে ওপরে উত্থিত এবং নিরেট কিউপোলায় সমাপ্ত। উল্লেখ্য যে, বর্গাকার নয় গম্বুজবিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদ সমগ্র মোগল ভারতের একমাত্র ব্যতিক্রম উদাহরণ। বলাবাহুল্য এরূপ মসজিদ নির্মাণের উৎস কিংবা অনুপ্রেরণা কি? এর প্রতিউত্তরে বলা যায় যে, সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণ দ্বারা মসজিদটির নির্মাণ পরিকল্পনা রচিত হয়ে থাকতে পারে, যা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের যথার্থ অনুকরণ বলেই অনুমিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পনেরো ও ষোলো শতকে নির্মিত বাগেরহাটের নয় গম্বুজ মসজিদ ও মসজিদকুড় মসজিদ, বরিশালের কসবা মসজিদ ও ফরিদপুরের সাতৈর মসজিদের নামোল্লেখ করা যায়। এসব মসজিদের অভ্যন্তরভাগ চারটি স্তম্ভ সহযোগে নয়টি বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত। তাছাড়া এর তিন দিকে তিনটি করে প্রবেশপথ এবং পূর্বদিকের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা (কেবলা) দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত। যদিও কসবা মসজিদে এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মাত্র দুটি পার্শ্ব প্রবেশপথ লক্ষণীয়। বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের এরূপ বিন্যাস হয়তো দিল্লির স্থাপত্য থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে। দিল্লির বিদ্যমান খিড়কী মসজিদের (১৩৭০) নয় গম্বুজ নির্মাণ পরিকল্পনা উল্লিখিত বিষয়ের সমর্থনে উপস্থাপন করা যায়। বর্ণিত মসজিদের ছাদ পঁচিশটি অংশে বিভক্ত – এর মধ্যে চারটি অংশ উন্মুক্ত ও বারোটি ক্ষেত্র সমতল ছাদে এবং অবশিষ্ট নয়টি অংশ নয়টি করে গম্বুজগুচ্ছে আচ্ছাদিত। এরূপ নয় গম্বুজগুচ্ছ প্রতিসমরূপে তিনটি করে সারিতে স্থাপন করা হয় এবং প্রতিটি গম্বুজগুচ্ছ পর্যায়ক্রমে নয়টি সমতল ছাদের সাথে সংস্থাপিত।[১০] প্রসঙ্গত এরূপ নয় গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত নির্মাণধারা খ্রিষ্টীয় নয় শতকের সূচনালগ্ন থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আলোচ্য রীতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রাচীনতম উদাহরণ আফগানিস্তানের বলখে নির্মিত মসজিদ-ই-তারিখ (নয় শতক) এবং দাব জুবাইদা কর্তৃক সৌদি আরবের কুরতে খননাবিষ্কৃত অনুরূপ নয় 'বে'-সংবলিত মসজিদের ভিত্তিভূমি উন্মোচিত হয়েছে।[১১] একই ধরনের নির্মাণ ঐতিহ্যের অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে সুসার কথিত বু ফাত্তা মসজিদ (৮৪০) ও কায়রোর শরীফ তাবাতবা মসজিদ (৯৫০)[১২] এবং টলেডোর বাব মর্দুম মসজিদ (৯৯৯) ও ইলদ্রিনের ইস্কি ক্যামি (১৪০৩)[১৩] প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২ আয়তাকার মসজিদ

২.১ তিন গম্বুজ রীতির আয়তাকৃতির মসজিদ

মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যে মোগলদের দ্বারাই তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ নির্মাণের সূচনা ঘটে, যা উত্তর ভারতীয় মসজিদ স্থাপত্যের হুবহু অনুকৃতি বলেই অনুমিত হয়। কিন্তু বাংলার প্রারম্ভিক মোগল উদাহরণসমূহ গঠনশৈলী ও অন্যান্য বিশেষত্বে উত্তর ভারতীয় পুরাকীর্তির সাথে তেমন একটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না। এ দেশের বৈরী আবহাওয়া ও নির্মাণকর্মে স্থানীয় কারিগরদের সম্পৃক্ততার কারণে মূলত এরূপ ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যাহোক বিবর্তনের মাধ্যমে আলোচ্য তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ পরিপূর্ণতা লাভের পাশাপাশি আদর্শরূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় উপমহাদেশে নামাজঘর কেন্দ্রিক এ রীতির মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনা লোদী ও সূরী আমালে প্রথম লক্ষ করা যায়, যার প্রকৃষ্ট উদহারণ হলো দিল্লির বড় গুম্বাদ মসজিদ (১৪৯৪) ও মথ-কী-মসজিদ (১৫০৫) এবং বিহারের রোটাসগড় মসজিদ (১৫৪৩)।[১৪] এরূপ নির্মাণ ঐতিহ্য পারসিক *ইওয়ান-ই-কারখা* রীতির মসজিদের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত অনুকরণ বলেই অনুমেয়।[১৫] প্রসঙ্গত *ইওয়ান-ই-কারখা*র আচ্ছাদন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও উভয় পার্শ্বস্থিত নলাকৃতির খিলানছাদের সমন্বয়ে গঠিত। দিল্লির সুলতানি স্থাপত্যের এ রীতি পরবর্তীতে মোগলদের বিভিন্ন রাজধানী শহর দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোরের বিখ্যাত মোগল মসজিদগুলো তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। তবে এসব মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা বৃহদাকারে নির্মিত। যাহোক বাংলার এ তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদসমূহ আবার দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত যথা– ক) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত মসজিদ ও খ) সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ। উভয় শ্রেণিভুক্ত মসজিদের অভ্যন্তরভাগ এক আইল বিশিষ্ট এবং পূর্ব-পশ্চিমে দুটি আড়াআড়ি খিলান দ্বারা তিনটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত। তবে প্রথম শ্রেণিভুক্ত মসজিদের কেন্দ্রীয় 'বে'-টি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্গাকার হওয়ায় মধ্যবর্তী অংশটি বৃহদাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং পার্শ্ববর্তী 'বে'-সমূহ সর্বদাই আকৃতিতে ছোট ও আয়তাকার পরিসরে রচিত। ফলে উভয় পার্শ্বের গম্বুজ কেন্দ্রীয় গম্বুজ অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির। আর দ্বিতীয় শ্রেণির মসজিদের 'বে'-সমূহ সম-আয়তনের বর্গাকার বিধায় এদের ছাদও সম-পরিমাপ বিশিষ্ট তিনটি গম্বুজে আবৃত। নিম্নে বাংলার তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদকে দুটি পৃথক শিরোনামে উপস্থাপন করা হলো।

২.১.১ বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত তিন গম্বুজ মসজিদ

ইসলাম খান মসজিদ (ভূমি নকশা-৩): পুরান ঢাকার ইসলামপুর রোডে আলোচ্য মসজিদটি অবস্থিত এবং ১৬৩২-৪০ সালে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক নির্মিত।[১৬] ইট সহযোগে নির্মিত এ মসজিদের অভ্যন্তরীণ পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১০.০৬ মিটার ও প্রস্থে ৪.১৫ মিটার। এর পূর্ব দেয়ালে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে একটি করে খিলানপথ। মসজিদের চারকোণার অষ্টভুজাকৃতির বুরুজগুলো ছাদের ওপরে বর্ধিত এবং এগুলোর শীর্ষভাগে রয়েছে কলস শীর্ষচূড়া শোভিত ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত নিরেট ছত্রী। কিবলা দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব কুলঙ্গি, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাব অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির এবং পার্শ্ববর্তীগুলো অগভীর আয়তাকার। কেন্দ্রীয় মিহরাব ও প্রবেশপথ সম্মুখদিকে প্রক্ষিপ্ত এবং এদের উভয় প্রান্তে রয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির সরু বুরুজ। বুরুজগুলো বপ্রের উপরিভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত এবং এগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস শীর্ষচূড়া শোভিত নিরেট ছত্রী। মসজিদের দেয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ থেকে উত্থিত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি প্রশস্ত আড়াআড়ি খিলান আয়তাকার নামাজঘরকে তিনটি অসম বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গটি বর্গাকার (৪.১৫ মিটার) এবং উভয় পার্শ্বের দুটি আয়তাকৃতির (৪.১৫ $\times$ ২.১৩ মিটার)। প্রতিটি 'বে'-বর্গের ওপরে আচ্ছাদন হিসেবে অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত হয়েছে একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজটি উভয় পার্শ্বের গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা বড়। তবে পার্শ্ববতী আয়তাকার 'বে'-বর্গ আচ্ছাদনে এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, যা ইতঃপূর্বে বাংলার স্থাপত্যে অজ্ঞাত হলেও পরবর্তীতে কৌশলটি উপর্যুপরি ব্যবহৃত হতে থাকে। আলোচ্য কৌশল অনুসারে পার্শ্ববর্তী আয়তাকার পরিসরের উপরিভাগে পূর্ব-পশ্চিম দেয়ালে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ প্রতিস্থাপন করে প্রাথমিকভাবে একটি বর্গাকার ক্ষেত্র তৈরিপূর্বক এর চার কোণায় আবার গোলায়িত মোগল পান্দানতিফ সংযোজনের মাধ্যমে সৃষ্ট গোলাকৃতির ক্ষেত্রের উপরিভাগে ক্ষুদ্র গম্বুজটি সংস্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাবের উপরিস্থ বদ্ধ খিলানসহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত দুটি প্রশস্ত খিলান এবং ওপরের অংশে চারকোণে সংযুক্ত ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ কেন্দ্রীয় গম্বুজের ভার বহন করছে। অনুরূপভাবে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে নির্মিত অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ এবং কোণের পান্দানতিফের ওপর পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয়ের ভার ন্যস্ত। বাংলার স্থাপত্যে আলোচ্য মসজিদ তিন গম্বুজ রীতির মসজিদের এক নতুর রীতির সূচনাকারী ইমারত হিসেবে চিহ্নিত। সাধারণ তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের তিনটি বর্গাকার 'বে'-এর ওপরে নির্মিত তিনটি সম-আকৃতির গম্বুজের পরিবর্তে আলোচ্য মসজিদে কেন্দ্রীয় গম্বুজ পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা বৃহদাকারে তৈরি। একইভাবে গম্বুজগুলোর নিম্নের তিনটি 'বে'-বর্গ অসম আকৃতি সম্পন্ন, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্গাকৃতির। সে তুলনায় পার্শ্ববর্তী 'বে'-বর্গ দুটি ছোট এবং আয়তাকৃতির পরিকল্পনায় রচিত। এরপর থেকে পরবর্তীতে বাংলায় তিন গম্বুজ রীতির মোগল মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বৃহদাকারে নির্মিত। তবে পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলো নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে বিভিন্ন সময় নানা কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত বাংলার অপরাপর মসজিদের মধ্যে নবরায় লেন মসজিদ (সতেরো শতক), রাজমহলের তথাকথিত আকবরী মসজিদ (সতেরো শতক), সিরসী মসজিদ (সতেরো শতক), রওশন মসজিদ (সতেরো শতক), শাহ সুজা মসজিদ (সতেরো শতক), ওয়ালীপুরের শাহ সুজা মসজিদ (১৬৫৬), মহাজন তলী মসজিদ (সতেরো শতক), শায়েস্তা খান মসজিদ (১৬৬৬), আন্দর কিল্লা মসজিদ (১৬৬৭), খাজা আম্বর মসজিদ (১৬৭৭-৭৮), চক মসজিদ (১৬৭৬), মুসা খান মসজিদ (সতেরো শতক), লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৬৭৮-৭৯), বিবি মরিয়ম মসজিদ (১৬৮০), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০), বাগ-ই-হামজা মসজিদ (১৬৮২), বখসি হামিদ মসজিদ (১৬৯২), পাথরঘাটা মসজিদ (সতেরো শতক), কমলাপুর মসজিদ (সতেরো শতক), শাহ পরাণ দরগাহ মসজিদ (সতেরো শতক), মাহমুদ খান মসজিদ (১৬৮২),আনোয়ার শহীদ মসজিদ (১৬৯৯), পাকুল্লা মসজিদ (সতেরো শতক), মরিয়ম সালেহ মসজিদ (১৭০৬), বড় শরীফ মসজিদ (১৭০৬-০৭), বড় জামালপুর মসজিদ (আঠারো শতক), বায়েজীদ বোস্তামী দরগা মসজিদ (আঠারো শতক), কদম-ই-মোবারক মসজিদ (১৭২৩), বজরা মসজিদ (১৭৪১-৪২), উলচাপাড়া মসজিদ (১৭৩০-৩০), সাইফাল্লাহ মসজিদ (১৭৪৮), খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদ (১৭০৪-০৫), নয়াবাদ মসজিদ (১৭৮৫), ইমামবারা মসজিদ (১৭৯১), ছেপড়াঝর মসজিদ (১৭৯৫), মাতুবী মসজিদ (১৮১৪-১৫), সীতারা মসজিদ (আঠারো শতক), সীতারা বেগম মসজিদ (১৮১৫), দারোগা আমীরউদ্দীন মসজিদ (উনিশ শতক), কাজী সদরউদ্দীন মসজিদ (আঠারো শতক), মাঝোপাড়া মসজিদ (আঠারো শতক) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত তালিকাভুক্ত মসজিদসমূহ বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। প্রতিটি গম্বুজ আবার অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় গম্বুজ নির্মাণে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও উভয় পার্শ্বস্থ গম্বুজদ্বয়ের ভার বহনে অবস্থান্তর ক্ষেত্রে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তবে কতিপয় মসজিদের ছাদ নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লা মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি সরাসরি গোলায়িত পান্দানতিফের ওপর ন্যস্ত এবং উভয় পার্শ্বের আয়তাকার 'বে'-সমূহ অভ্যন্তরীণভাবে ক্রুশাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত হলেও এর উপরিভাগে ক্ষুদ্রাকৃতির মেকি গম্বুজ সংস্থাপিত। বলাবাহুল্য ছাদ নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে মসজিদটি মোগল বাংলার স্থাপত্যে বিশেষ চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছে। এ রীতির অন্যান্য উদাহরণ হলো বাগ-ই-হামজা মসজিদ, মাহমুদ খান মসজিদ ও বখসি হামিদ মসজিদ। তাছাড়া তিন গম্বুজবিশিষ্ট বিবি মরিয়ম মসজিদ ব্যতিক্রমী ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এবং এ রীতির এটিই একমাত্র জ্ঞাত উদাহরণ। মসজিদটি তিনটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-সমূহ বর্গাকারে রচিত। এ পদ্ধতি সফল করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী 'বে'-বর্গের পূর্ব ও পশ্চিম দেয়াল তুলনামূলকভাবে পুরু করে নির্মাণ করা হয়েছে। আলোচ্য মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ অপরাপর গম্বুজের ভার বহনে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার লক্ষণীয়। অনুরূপভাবে মুসা খান মসজিদের কেন্দ্রীয়

গম্বুজ অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান সহযোগে নির্মিত হলেও উভয় পার্শ্বের গম্বুজদ্বয়ের নিম্নাংশে অবস্থান্তর পর্যায়ে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে সীতারা মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ নির্মাণে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি এবং উভয় পার্শ্বের গম্বুজদ্বয়ের ভার বহনে স্কুইঞ্চ খিলান ও অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

বাংলার স্থাপত্যে লালবাগ দুর্গ মসজিদ (আলোকচিত্র-৩) তিন গম্বুজ রীতির মোগল আদর্শ নকশার মসজিদের পূর্ণাঙ্গ রূপ হিসেবে পরিগণিত, যার সূচনা ইতঃপূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। আর এ রীতির বিকশিত রূপ সতেরো শতকে নির্মিত রাজমহল ও শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদদ্বয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। বাংলার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মোগল মসজিদ উত্তর ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য বিশেষ করে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোরে বিকশিত মোগল স্থাপত্য রীতির প্রাদেশিক সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। আবার মালদহ জামি (১৫৯৬) ও রাজমহল মসজিদে (১৫৯৫-৯৬) উত্তর ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব বর্ধিতরূপে প্রতিভাত হয়েছে। আর মালদহ জামির দেয়ালগাত্রের পলেস্তারার আস্তরণ, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিতকরণ, পদ্ম ও কলস শীর্ষদণ্ড, খাটো কন্দাকৃতির গম্বুজ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সামগ্রিকভাবে বাংলায় সর্বপ্রথম প্রবর্তনের জন্য সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। তাছাড়া লালবাগ দুর্গ মসজিদের সমকালীন কিংবা পরবর্তী সময়ে নির্মিত ঢাকাস্থ মসজিদসমূহ যথাক্রমে খাজা শাহবাজ মসজিদ (১৬৭৯), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০) এবং খান মুহম্মদ মির্ধার মসজিদে (১৭০৪) কিছু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান। অর্থাৎ বাংলার মোগল মসজিদের পূর্ব ফাসাদে সাধারণত দেয়ালসংযুক্ত দুটি আলংকারিক সরু বুরুজ ব্যবহৃত হলেও খাজা শাহবাজ মসজিদ ও সাতগম্বুজ মসজিদের ফাসাদে চারটি এবং খান মুহম্মদ মির্ধার মসজিদের ফাসাদে ছয়টি আলংকারিক সরু বুরুজের সংযোজন অনেকটাই বৈচিত্র্যময়।[১৭] তবে সাতগম্বুজ মসজিদের (আলোকচিত্র-৪) চারকোণের চারটি ফাঁপা বুরুজ পুরনো ঢাকার হোসেনী দালান (১৬৪২) ও বড় কাটরার (১৬৪৪) অনুরূপ উদাহরণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা দিল্লির মথ-কী-মসজিদের (১৫০৫) পশ্চাৎ দেয়ালের উভয় কোণে সংযোজিত দ্বিতলাকৃতির অষ্টভুজি ফাঁপা বুরুজের হুবহু অনুকৃতি বলে ধরে নেয়া যায়।[১৮]

২.১.২ সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ

খেরুয়া ও চাটমোহর মসজিদ (ভূমি নকশা-৪; আলোকচিত্র-৫): প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত ইটের তৈরি পাবনা জেলার চাটমোহর মসজিদ ও বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ একই ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীতে নির্মিত। প্রথমোক্ত মসজিদ ১৫৮১-৮২ সালে বিদ্রোহী মোগল সামরিক কর্মকর্তা মাসুম খান কাবুলী কর্তৃক নির্মিত।[১৯] ১৮.২৮ × ৮.২২ মিটার বাহ্যিক পরিমাপের আলোচ্য মসজিদের শিলালিপি পর্যালোচনায় জানা যায় যে, মসজিদটির নির্মাতা মাসুম খান কাবুলী সুলতান উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।[২০] অন্যদিকে বগুড়া জেলার খেরুয়া মসজিদ মাসুম

খান কাবুলীর ঘনিষ্ঠ মিত্র ও জহুর আলী খান কাকশালের পুত্র মীর্জা মুরাদ খান কাকশাল কর্তৃক ৯৮৯ হিজরি মোতাবেক ১৫৮২ সালে নির্মিত।[২১] এর বাহ্যিক পরিমাপ ১৭.৬৭ × ৭.৬২ মিটার। উভয় মসজিদের অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ ছাদের বক্রাকার কার্নিশ বরাবর উত্থিত। এদের সম্মুখ দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট পাঁচটি দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানপথ রয়েছে। পূর্ব দিকের তিনটি খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে খাঁজ খিলান সংবলিত তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকার মিহরাব কুলঙ্গি বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাব অপেক্ষা কিছুটা বড়। দুটি বৃহদাকৃতির খিলান দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তরভাগ তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ মসজিদের ছাদ তিনটি সমায়তনের গম্বুজের সমন্বয়ে গঠিত। গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে কর্বেল পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উভয় মসজিদ পোড়ামাটির ফলক নকশায় সজ্জিত এবং অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত গোলাপ ফুল, খাঁজ খিলান, *কানজুরা* নকশা ও বিভিন্ন ধরনের পত্র নকশা মসজিদের সার্বিক সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির এ দেশের অপরাপর মোগল মসজিদের মধ্যে বগুড়া জেলার খোন্দকার তোলা মসজিদ (১৬৩২), যশোরের মির্জানগর মসজিদ (সতেরো শতক), গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (সতেরো শতক), খাজা শাহবাজ মসজিদ (১৬৭৯), রংপুরের কাজীপাড়া মসজিদ (সতেরো শতক), ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আরিফাইল মসজিদ (সতেরো শতক), রংপুরের দরিয়াপুর মসজিদ (১৭১৭-১৮), শাহজালাল দরগা মসজিদ (১৭৪৪), কুষ্টিয়ার ঝাউদিয়া মসজিদ (আঠারো শতক), সিলেটের ফতেহ খানের মসজিদ (১৭২৭), রংপুরের ফুলহার মসজিদ (সতেরো শতক), কামদিয়া মসজিদ (সতেরো শতক), দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ (১৭৪০-৪১), লালমনিরহাটের নয়ারহাট মসজিদ (১৭৬২-৬৩), রংপুরের কাজীতাড়ী মসজিদ (সতেরো শতক), তংকা মসজিদ (সতেরো শতক), মাস্তা মসজিদ (সতেরো শতক), মিঠাপুকুর মসজিদ (আঠারো শতক), কুড়িগ্রামের বেলদহ মসজিদ (আঠারো শতক), রাজশাহীর বাগদানী মসজিদ (আঠারো শতক), কিসমত মাড়িয়া মসজিদ (আঠারো শতক), তরফ পারিলা মসজিদ (আঠারো শতক), নাটোরের নাবিয়া পাড়া মসজিদ (আঠারো শতক) ও বাউরা মসজিদ (আঠারো শতক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত মসজিদগুলোর সম-আকৃতির গম্বুজ তিনটি অষ্টভুজাকৃতির কিংবা গোলায়িত পিপার ওপর সংস্থাপিত। আর ছাদ নির্মাণ কৌশল হিসেবে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল মসজিদের অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যতিক্রম উদাহরণ হিসেবে শাহজালাল দরগা মসজিদের ছাদ নির্মাণে একই সাথে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের পাশাপাশি ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়, যা শাহজালাল দরগা মসজিদেও অনুসৃত হয়েছে। তবে এ যুগের কোনো কোনো মসজিদের ছাদ

নির্মাণে অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে প্রাক-মোগল সুলতানি স্থাপত্যের ন্যায় বাঙালি পান্দানতিফ পদ্ধতির প্রয়োগের নজির পাওয়া যায়।

বগুড়া জেলার খোন্দকার তোলা মসজিদ ভূমি নকশা, গঠনশৈলী ও অলংকরণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বর্ণিত খেরুয়া ও চাটমোহর মসজিদের প্রতিলিপি হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। তবে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ ও মিহরাব উদ্‌গতপূর্বক সরু বুরুজ বেষ্টিতকরণ বিশেষত্বে আলোচ্য মসজিদ পূর্ববর্তী মসজিদদ্বয় থেকে কিছুটা ভিন্নতর।[২২] বলাবাহুল্য বাংলার স্থাপত্যে মালদহ জামি মসজিদে এ রীতি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়, যা মূলত উত্তর ভারতীয় মোগল নির্মাণ ঐতিহ্যের এক জনপ্রিয় অনুকরণ এবং ফতেপুর-সিক্রি জামি (১৫৭১) ও আগ্রা জামি মসজিদ (১৬৪৮) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া গৌড়ের শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ যথাসম্ভব সম-আকৃতির তিন গম্বুজ রীতির আদর্শিক মোগল মসজিদের প্রাচীনতম বিদ্যমান উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত। গৌড়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত লালবাজার মসজিদ (সতেরো শতক) ও রাজমহল জামি মসজিদ ভূমি নকশা, গঠনশৈলী ও অন্যান্য বিশেষত্বে শাহ নিয়ামতউল্লাহ ওয়ালীর মসজিদের অনুলিপি এবং গৌড়স্থ মসজিদে মোগল বাংলার স্থাপত্যের উন্নত রীতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, যা মোগলদের রাজধানী শহর ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের স্থাপত্য-নিদর্শনে বিশেষভাবে দৃশ্যমান। আর খাজা শাহবাজ মসজিদের দেয়ালগাত্রে প্রোথিত যুগল স্তম্ভ শীর্ষ থেকে উথিত দুটি বৃহদাকৃতির বহু খাঁজ খিলান দ্বারা মসজিদ অভ্যন্তর তিনটি সম-বর্গাকার অংশে বিভক্তকরণ রীতি আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরস্থ সম্রাট শাহজাহানের খাস মহল এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব নির্মিত দিল্লি দুর্গের মতি মসজিদের (১৬৬২) যথার্থই অনুকরণ বলে ধরে নেয়া যায়।[২৩] এছাড়া রংপুরের কাজীপাড়া মসজিদের অন্যতম বিশেষত্ব হলো পোড়ামাটির অলংকরণ এবং অলংকরণ বিষয়বস্তু হিসেবে গোলাপ ফুল, পুষ্পশোভিত লতাপাতা নকশা ও বিভিন্ন ধরনের জ্যামিতিক নকশা উপস্থাপিত হয়েছে, যা সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া নয়ারহাট মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাব শীর্ষে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের অভ্যন্তরে সুদৃশ্য মুকার্নাস সজ্জা একটি আকর্ষণীয় বিশেষত্ব, যা সতেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে ঢাকা ও রাজমহলে নির্মিত পুরাকীর্তিসমূহের অনুরূপ উদাহরণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[২৪] এতদ্ভিন্ন বগুড়ার খেরুয়া ও চাটমোহর মসজিদ মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ইমারত, যাদের মাধ্যমেই মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যে তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণরীতির সূচনা হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, মসজিদের পৃষ্ঠপোষক ও নির্মাতা মাসুম খান কাবুলী সম্ভবত বিহারের তিন গম্বুজবিশিষ্ট উল্লিখিত মসজিদগুলো সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। কেননা তিনি বাংলায় আগমনের পূর্বে সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৬-১৬০৫) মোগল সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে বিহারে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।[২৫] আর মির্জা মুরাদ খান কাকশাল মাসুম খান কাবুলীর অন্যতম ঘনিষ্ঠ

সহযোগী হিসেবে নেতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্বক আলোচ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন বলেই অনুমিত হয়।

২.২ পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ

টেঙ্গা মসজিদ (ভূমি নকশা-৫): মসজিদটি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার ঈশ্বরীপুর ইউনিয়নের টেঙ্গা গ্রামে অবস্থিত। আয়তাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত আলোচ্য মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ ৪১.১৫ × ১০.৬৭ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৩৬.৮৮ × ৬.৪০ মিটার। মসজিদের নামাজঘর এক আইল বিশিষ্ট এবং পাঁচটি স্বতন্ত্র বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় বে-বর্গটি বৃহদাকৃতির (৬.৫২ মিটার) হলেও উভয় পার্শ্বের 'বে'-বর্গসমূহ তুলনামূলক ক্ষুদ্রাকৃতির (৫.৭৩ মিটার)। প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় গম্বুজ বৃহদাকৃতির এবং উভয় পার্শ্বের দুটি করে মোট চারটি গম্বুজ অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রতিটি গম্বুজ অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া মণ্ডিত। গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান ও বাঙালি পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর চার কোণায় রয়েছে চারটি অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো সমান্তরাল কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত এবং শীর্ষদণ্ডযুক্ত কিউপোলায় শোভিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ সম্মুখদিকে উদগত পরিকল্পনায় নির্মিত। নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় মসজিদটি মোগল যুগের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি। কিন্তু এর প্রকৃত নির্মাতা কে ছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। ১৬১২ সালে রাজা মানসিংহ এক যুদ্ধে রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করে অত্র এলাকায় স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আলোচ্য মসজিদ তারই নির্মাণকীর্তি বলে ধরে নেয়া যায়।[২৬] মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী উদাহরণ এবং মোগলদের তিন গম্বুজ মসজিদের বর্ধিতায়ন কিংবা সম্প্রসারণ হিসেবে বাংলার স্থাপত্যে এরূপ পাঁচ গম্বুজ রীতির মসজিদের উদ্ভব হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

করতলব খান মসজিদ (আলোকচিত্র-৬): ঢাকার বেগম বাজার সংলগ্ন আলোচ্য মসজিদ *দীউয়ান* মুর্শিদকুলী খান ওরফে করতলব খান কর্তৃক ১৭০০-০৪ সালে নির্মিত।[২৭] মসজিদটি বেগম বাজার মসজিদ নামেও পরিচিত। আয়তাকার পরিকল্পনায় রচিত এ মসজিদ নিম্নতল কক্ষ সংবলিত উঁচু মঞ্চস্থি মসজিদের শ্রেণিভুক্ত, যা মোগল বাংলার অসংখ্য উদাহরণের অনুলিপি হিসেবে স্বীকৃত। ২৮.৬৫ × ৮.২৩ মিটার আয়তন বিশিষ্ট মসজিদটির অভ্যন্তরভাগে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত চারটি চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা পাঁচটি 'বে'-তে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় 'বে'-টি বর্গাকার এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য আয়তাকার 'বে'-গুলো থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। তবে ভূমি পরিকল্পনা ও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে আলোচ্য মসজিদ ওপরে বর্ণিত পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট টেঙ্গা মসজিদের অনুকৃতি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অর্থাৎ মসজিদের কেন্দ্রীয়

'বে'-বর্গ বৃহদাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং উভয় পার্শ্বের প্রতিটি আয়তাকার 'বে'-বর্গ অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজে আবৃত। গম্বুজগুলো আবার অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং পদ্ম ও কলস চূড়ায় শোভিত, যা মোগল স্থাপত্যের অন্যতম নির্মাণ ঐতিহ্য। গম্বুজের ভার বহনে ব্যবহৃত পদ্ধতি ঢাকার লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৬৭৮-৭৯) ও সাত গম্বুজ মসজিদে (১৬৮০) প্রয়োগকৃত কৌশলের অনুরূপ। অর্থাৎ মধ্যবর্তী বর্গাকার 'বে' সংশ্লিষ্ট বৃহদাকৃতির গম্বুজ সরাসরি ত্রিকোণাকার পান্দানতিফের ওপর ন্যস্ত। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আয়তাকৃতির 'বে' শীর্ষে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ নির্মাণপূর্বক বর্গাকার পরিসরে রূপান্তর করা হয়েছে। এরূপ বর্গাকার ক্ষেত্রের চার কোণায় আবার পান্দানতিফ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে গোলাকার কাঠামো তৈরিপূর্বক ছোট ছোট গম্বুজে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। মসজিদের চার কোণে সংযোজিত চারটি অষ্টভুজাকৃতির কলসভিত্তি শোভিত কোণস্থিত বুরুজগুলো আনুভূমিক বপ্র ছেড়ে ওপরে উত্থিত। কোণস্থিত বুরুজগুলো ছোট গম্বুজসহ বদ্ধ ছত্রী এবং পদ্ম ও কলস শোভিত শীর্ষদণ্ডে শোভিত।

সরাইল মসজিদ (ভূমি নকশা-৬): আলোচ্য মসজিদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলা সদরে অবস্থিত। ইট সহযোগে এ মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় (বহিস্থ পরিমাপ ১৪.৩৩ × ৭.৬২ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১১.২৮ × ৪.৮৮ মিটার) নির্মিত। মসজিদের অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজসমূহ বক্রাকার কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত এবং নিরেট কিউপোলায় মণ্ডিত। পূর্ব-পশ্চিমে প্রশস্ত দুটি খিলান দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ তিনটি অংশে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গটি অপেক্ষাকৃত বড় ও বর্গাকার (৪.৭৫ মিটার) পরিকল্পনায় রচিত। অথচ উভয় পার্শ্বের 'বে'-বর্গ দুটি ছোট ও আয়তাকার (৪.৭৫ × ১.৯৮ মিটার) পরিসরে গঠিত। কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গ গোলায়িত পিপার ওপর ন্যস্ত একটি বৃহদাকার গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু উভয় পার্শ্বের আয়তাকার 'বে'-দুটির অভ্যন্তরীণ দিক থেকে *চৌচালা* রীতির খিলানছাদে আবৃত। তবে বাইরের দিকে দুটি করে মোট চারটি গম্বুজ বিদ্যমান। সুতরাং বাহ্যিকভাবে মসজিদটি পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট – বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও চারকোণার চারটি ক্ষুদাকৃতির গম্বুজ। প্রধান প্রবেশপথ ও মিহরাব ব্যতীত সমগ্র মসজিদের দেয়ালগাত্র স্বল্প গভীর আয়তাকার প্যানেলসহ পলেস্তারার আস্তরণে অলংকৃত। তবে প্রবেশপথ ও মিহরাব এলাকা পোড়ামাটির ফলক নকশায় সজ্জিত। শিলালিপি অনুযায়ী মসজিদটি ১০৭৪ হিজরি মোতাবেক ১৬৬৩ সালে নির্মিত।[২৮] উল্লেখ্য যে, একটি বড় কেন্দ্রীয় গম্বুজ এবং চারকোণে চারটি ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত মসজিদটি মোগল বাংলার স্থাপত্যে এক বিরল রীতির জন্ম দিয়েছে। মসজিদ স্থাপত্যের এ রীতি বাংলায় প্রথম পরিলক্ষিত হয় কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে অবস্থিত কুতুবশাহী মসজিদে (ষোল শতক)।[২৯] আলোচ্য নির্মাণরীতির অনুপ্রেরণা দিল্লির রাজকীয় স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে প্রোথিত বলেই অনুমিত হয়, যার অন্যতম উদাহরণ হলো জামাত খানা মসজিদ (১৩১০-১৬)।[৩০] আলোচ্য মসজিদের নামাজঘর আচ্ছাদিতকরণে এরূপ গম্বুজগুচ্ছের ব্যবহার বিহারের সুর স্থাপত্য বিশেষ করে পাটনার শেরশাহের মসজিদ (১৫৪০)

এবং চৌদ্দ শতকে নির্মিত দিল্লির খিড়কি মসজিদের একাধিক গম্বুজগুচ্ছের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৩১]

ওয়ালীপুর আলমগীর মসজিদ (ভূমি নকশা-৭): মসজিদটি চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত ওয়ালীপুর গ্রামে অবস্থিত। আলোচ্য মসজিদ ওপরে বর্ণিত পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট সরাইল ও অষ্টগ্রাম মসজিদের অনুকরণে ১১০৪ হিজরি মোতাবেক ১৬৯২ সালে নির্মিত।[৩২] আয়তাকার এ মসজিদের (১৫.২৪ × ৮.২৩ মিটার) পূর্ব দিকের সম্মুখভাগের মধ্যবর্তীস্থানে উভয় প্রান্তে অষ্টভুজাকৃতির ক্ষুদ্র বুরুজ বেষ্টিত একটি অভিক্ষিপ্ত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত প্রধান প্রবেশপথ সুউচ্চ খিলান ও অর্ধ-গম্বুজে শোভিত। তবে আলোচ্য মসজিদের অভ্যন্তরীণভাগ দুটি অষ্টভুজাকৃতির ইটের স্তম্ভ দ্বারা পাঁচটি বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। ৫.৮৭ মিটার পরিমাপ বিশিষ্ট বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় অংশটি সুবিশাল কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং এর উভয় পার্শ্বে পূর্ব-পশ্চিম অক্ষে নির্মিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির 'বে'-বর্গ চারটি কিউপোলা সদৃশ গম্বুজে আবৃত। গম্বুজগুলো গোলাকার পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং পদ্ম ও কলস শিরোচূড়ায় সুশোভিত। আর গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কাটরা মসজিদ: ১৭২৪-২৫ সালে আদর্শ মোগল রীতিতে নির্মিত মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের বাহ্যিক আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩৯.৬১ মিটার ও প্রস্থে ৭.৩১ মিটার। আলোচ্য মসজিদ পাঁচটি কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজের নিম্নাংশে ফাঁকা স্থান ভরাটকরণে কর্বেল পান্দানতিফ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। মসজিদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আয়তাকার স্বল্প গভীর প্যানেল সজ্জা, আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত ইওয়ান সদৃশ কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ, পত্র নকশা সংবলিত সমান্তরাল বপ্র ও ছাদের ওপরে কোণস্থিত বুরুজের উত্থিতকরণ উল্লেখযোগ্য। তবে এর অপর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো প্রবেশপথের সম্মুখে ইউরোপীয় শৈলীর গোলাকার খাঁজ খিলানের ব্যবহার।[৩৩] বলাবাহুল্য ইউরোপীয় নির্মাণ রীতির প্রভাবপুষ্ট মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ বাংলার স্থাপত্যের প্রারম্ভিক উদাহরণসমূহের অন্যতম।

পাঁচ গম্বুজ মসজিদ বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এ ধারার আবার দুটি ধরন রয়েছে – একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও প্রতিপাশে একই সারিতে একজোড়া করে ছোট গম্বুজ এবং একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও চারকোণায় চারটি ক্ষুদ্র গম্বুজ। টেঙ্গা মসজিদ প্রথম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও সরাইলের হাটখোলা মসজিদ, ওয়ালীখান মসজিদ ও কাটরা মসজিদ দ্বিতীয় ধারার মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম উদাহরণ। পরবর্তীকালে এ ধারার হুবহু প্রতিফলন দেখা যায় দু-শতক পরে নির্মিত ঢাকার বেচারাম দেউড়ি মসজিদে (১৮৭২)।[৩৪] আলোচ্য মসজিদ নির্মাণ পরিকল্পনার দিক থেকে ওয়ালীপুর আলমগীরী মসজিদের অনুরূপ। বাংলায় এরূপ মসজিদ নির্মাণধারার সূচনা হয়েছিল মূলত অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ (ষোল শতক) নির্মাণের মধ্যদিয়ে, সরাইল হাটখোলা মসজিদে এর বিস্তৃতি ঘটে এবং ওয়ালীপুর

আলমগীরী মসজিদে এ ধারা বস্তুত আদর্শিক রূপ লাভ করে। এ ধরনের নির্মাণ পরিকল্পনা উত্তর ভারতের দিল্লিস্থ জামাতখানা মসজিদ ও আগ্রাস্থ হুমায়ূনের মসজিদের (১৫৩০) অনুরূপ নির্মাণরীতির বিকশিত বা বিবর্তিত রূপ বলেই প্রতীয়মান হয় এবং পূর্ব ভারতের পাটনায় অবস্থিত শেরশাহের সমাধি (১৫৪০) একই ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত।[৩৫] স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে দিল্লির এ নির্মাণ ঐতিহ্যের আদি উৎস কোথায়? উসমানীয় শাসনামলে টোকা-তে (Tokat) নির্মিত রোস্তম সেলিবির মসজিদ (পনেরো শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত) সম্ভবত এ ধারার প্রাথমিক উদাহরণ। পরবর্তীতে একই ধারায় নির্মিত অন্যান্য মসজিদের মধ্যে হায়রাবুলর গুজেলচি হাসান বে মসজিদ (১৪০৬), এদ্রিনের উক সেরেফেলি ক্যামি (১৪৩৭-১৪৪৭), ইস্তাম্বুলের বাইজিদ মসজিদ (১৫০১-১৫০৬), সুলাইমানিয়া মসজিদ (১৫৫০-১৫৫৯) ও এদ্রিনের সেলিমিয়া মসজিদ (১৫৬৯-১৫৭৫) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬] বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এরূপ মসজিদ পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলী সম্পাদনে নির্মাতা এবং নির্মাণ শিল্পীগণ যথেষ্ট যোগ্যতা ও উদ্ভাবন কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন। পাঁচ 'বে'-সংবলিত বা পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ পরিকল্পনায় নির্মিত অটোমান মসজিদগুলো সম্ভবত সিরিয়ার প্রাথমিক কিছু উদাহরণের অনুকরণে নির্মিত হয়ে থাকতে পারে। অতএব, বাংলায় দ্বিতীয় ধারার পাঁচ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা বাংলার স্থপতিদের নিজস্ব উদ্ভাবন ছিল না এবং উপর্যুক্ত উৎসসমূহ হতে কিংবা তুরস্ক ও ভারতীয় স্থাপত্য ঐতিহ্য হতে এটি উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে।

২.৩ ছয় গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ

মোল্লা মিসকিন মসজিদ (ভূমি নকশা-৮): খ্রিষ্টীয় সতেরো শতকে নির্মিত চট্টগ্রাম শহরের মহসীন কলেজ সংলগ্ন ছোট টিলার শীর্ষে আলোচ্য মসজিদ অবস্থিত। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ ১০.২৪ × ৭.১৯ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৮.৪১ × ৫.১৮ মিটার। মসজিদটি দু-আইল ও তিন 'বে'-বিশিষ্ট এবং ছয়টি প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর সংস্থাপিত একটি করে কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজের নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থান ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। ভূমি নকশা ও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে আলোচ্য মসজিদ সুলতানি মসজিদের হুবহু অনুকৃতি বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত ঢাকার রামপাল মসজিদ (১৪৮৩), গৌড়ের ঝনঝনীয়া মসজিদ (১৫৩৫), বাগেরহাটের গলাকাটা মসজিদ (ষোলো শতক) ও নওগাঁ জেলার কুসম্বা মসজিদ (১৫৫৮) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উল্লিখিত সুলতানি বাংলার অনুরূপ নিদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হলেও আলোচ্য মসজিদ মোগল আদর্শ রীতির এক অনন্য উদাহরণ। মোগল শৈলীর মধ্যে সমান্তরাল বপ্র, কার্নিশ থেকে ওপরে উত্থিত কোণস্থিত বুরুজ, গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলস শিরোচূড়া সংযোজন, অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর গম্বুজ সংস্থাপন, সরু বুরুজ বেষ্টিত প্রক্ষিপ্ত কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ, পলেস্তারার অলংকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য মসজিদ সমগ্র মোগল

বাংলায় নির্মিত এ রীতির প্রথম উদাহরণ এবং ভূমি নকশার দিক থেকে সুলতানি স্থাপত্যের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

ওয়ালীখান মসজিদ (ভূমি নকশা-৯; আলোকচিত্র-৭): চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন চৌমুহনী এলাকায় অবস্থিত আলোচ্য মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত, যার বহিস্থ পরিমাপ ২০.৪২ × ১২.৮০ মিটার এবং অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ১৭.৮৬ × ১২.২৪ মিটার। মসজিদটি এক সারি স্তম্ভ দ্বারা দু-আইল ও তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গ আবার একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজগুলো অষ্টভুজি পিপার ওপর সংস্থাপিত। গম্বুজ নির্মাণের কৌশল হিসেবে অবস্থান্তর পর্যায়ে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ ছয় গম্বুজবিশিষ্ট বর্ণিত এ মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলী বিবেচনায় উপর্যুক্ত মোল্লা মিসকিন মসজিদের অনুলিপি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। সুতরাং নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় ১৭১৪-১৯ সালে নির্মিত মসজিদটির নির্মাতা ওয়ালী খান চট্টগ্রাম অঞ্চলের একজন মোগল প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।[৩৭]

২.৪ দশ গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকৃতির মসজিদ

কুতুবশাহী মসজিদ (আলোকচিত্র-৮): মালদহ জেলার হযরত পাণ্ডুয়ার একলাখী সমাধি ও প্রখ্যাত সুফি-সাধক নূর কুতুব উল-আলমের সমাধির মধ্যবর্তী স্থানে আলোচ্য মসজিদ অবস্থিত এবং মখদম শেখ কর্তৃক ৯৯০ হিজরি মোতাবেক ১৫৮২ সালে নির্মিত।[৩৮] মসজিদটি মোগল আমলে নির্মিত হলেও নির্মাণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় গৌড়ের সুলতানি মসজিদের অনুকৃতি বলে চিহ্নিত হবার যোগ্য। প্রসঙ্গত ইটের তৈরি এ মসজিদের বহির্গাত্র প্রস্তর আস্তরণে আচ্ছাদিত। এতদ্বিবেচনায় মসজিদটি গৌড়ের বড়সোনা কিংবা ছোটসোনা মসজিদ অথবা নওগাঁ জেলার কুসম্বা মসজিদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ২৫.১০ × ১১.৫০ মিটার বাহ্যিক আয়তন বিশিষ্ট এ মসজিদের অভ্যন্তরভাগ বহুভুজ সংবলিত পাথরের স্তম্ভ দ্বারা পাঁচটি 'বে' এবং কিবলা দেয়ালের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত দু-সারি গলিপথে বিভক্ত। দশটি বর্গাকৃতির 'বে'-বিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদ তাই দশটি গম্বুজে আচ্ছাদিত এবং গম্বুজসমূহ সরাসরি ইটের তৈরি বাংলা পান্দানতিফের ওপর ন্যস্ত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে দুটি করে দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলানপথ বিদ্যমান। পূর্ব দেয়ালের পাঁচটি খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব *কুলঙ্গি*। মসজিদের খিলানপথ শীর্ষ এবং বক্রাকার কার্নিশ শীর্ষ পেঁচানো দড়ি সদৃশ্য স্ফীত ব্যান্ড দ্বারা অলংকৃত এবং প্রবেশপথ ও মিহরাবের খিলানের ত্রিকোণাকার ভূমিসমূহ ফুলেল নকশায় সজ্জিত। বাংলার স্থাপত্যে দশ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের প্রাচীনতম উদারণ হলো ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদ (১২৯৮), গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৮০) ও রাজশাহী জেলার বাঘা মসজিদ (১৫২৩)। সুতরাং ধারণা করা হয় যে, বাংলার মোগল স্থাপত্যের ইতিহাসে দশ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণধারা সুলতানি বাংলার অনুরূপ নির্মাণরীতি দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত কিংবা প্রভাবিত হয়েছে বলেই অনুমিত হয়।

৩ বারান্দাযুক্ত মসজিদ

৩.১ বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজ মসজিদ

আতিয়া মসজিদ (ভূমি নকশা-১০, আলোকচিত্র-৯): শিলালিপি অনুসারে মসজিদটি টাঙ্গাইল জেলার বিখ্যাত জমিদার বাইজিদ খান পন্নীর পুত্র সাঈদ খান পন্নী কর্তৃক কথিত পীর আলী শাহানশাহ কাশ্মেরীর সৌজন্যে ১০১৮ হিজরি মোতাবেক ১৬০৯ সালে নির্মিত।[৩৯] আলোচ্য মসজিদ দুটি অংশের একটি বর্গাকার নামাজঘর এবং অপরটি নামাজঘরের সম্মুখস্থ একটি টানা বারান্দা – সমন্বয়ে গঠিত। নামাজঘরের প্রতি বাহুর পরিমিতি ৭.০২ মিটার এবং বারান্দার পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৭.০২ মিটার ও প্রস্থে ৩.০৮ মিটার। মসজিদের নামাজঘর অষ্টভুজাকৃতির পিপার ওপর সংস্থাপিত একটি মাত্র বিশালাকৃতির গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত, অথচ টানা বারান্দার উপরিভাগে রয়েছে তিনটি গম্বুজ। নামাজঘরের গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ইটের সরু ও প্রসারিত বিন্যাসে রচিত বাঙালি পান্দানতিফ ও অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কইঞ্চ খিলান ব্যবহৃত হলেও বারান্দার গম্বুজের নিম্নাংশে কেবলমাত্র পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে দৃশ্যমান। এর চার কোণায় রয়েছে চারটি অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ, যেগুলো নিরেট ছত্রী শোভিত। বলাবাহুল্য পিপার ওপর গম্বুজ সংস্থাপন উত্তর ভারতীয় এ রীতিটি আলোচ্য ইমারতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাংলার স্থাপত্যে আত্মীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে মোগল বাংলার প্রায় প্রতিটি মসজিদে ধারাবাহিকভাবে এ রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। অথচ ভূমি নকশা ও অন্যান্য বিশেষত্বে যেমন– বক্রাকার কার্নিশ, পোড়ামাটির অলংকরণ, অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব *কুলঙ্গি*, দ্বি-কেন্দ্রিক কৌণিক খিলান, স্কুইঞ্চ ও পান্দানতিফের প্রয়োগে আতিয়া মসজিদ সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণ। যথা– দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০) ও সুরা মসজিদ (পনেরো শতক), গৌড়ের লট্টন মসজিদ (পনেরো শতক) ও খানিয়াদিঘি মসজিদ (১৪৭৯), বারোবাজারের গোড়ার মসজিদ (পনেরো শতক) ও সিংদহ আউলিয়া মসজিদ (পনেরো শতক), সিলেটের শঙ্কর পাশা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), পাবনার নবগ্রাম মসজিদ (১৫২৬) এবং পটুয়াখালীর মসজিদবাড়ি মসজিদ (পনেরো শতক) প্রভৃতির অনুকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বলা যায় যে, মসজিদটি মোগল ও সুলতানি নির্মাণরীতির আনন্দঘন সমাহারের এক অভিনব ফসল।

বাংলার সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত এসব মসজিদের সম্মুখে বারান্দার সংযোজন গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর কিংবা মাটির ঘরবাড়ির সামনে সংযুক্ত বারান্দার হুবহু অনুকৃতি বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে কেউ কেউ বাংলার এরূপ ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদের উৎস ভারতীয় কিংবা ভারত বহির্ভূত মধ্যযুগীয় নির্মাণরীতি বিশেষ করে উসমানীয় স্থাপত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। এরূপ বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজবিশিষ্ট ইমারতের বিদ্যমান জ্ঞাত ভারতীয় প্রাদেশিক উদাহরণ হলো আহমদাবাদের দরিয়া খানের সমাধি (১৪৫৩) এবং উসমানীয় শাসনামলে নির্মিত কারামানের বেলিক দেভানডস মসজিদ, বুসরার আলাউদ্দীন মসজিদ (১৩২৬), হাজী উজবেক মসজিদ (১৩৩৩), ইজনিকের গ্রীন মসজিদ (১৩৭৮), ইস্তাম্বুলের ফিরূজ আগা মসজিদ (১৪৯০), মাজানির ইলদ্রিন বাইজিদ মসজিদ

(১৩৮২), ইস্কি ক্যামি (১৪৫০) প্রভৃতি এ রীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।[৪০] বাংলার স্থাপত্যে উপর্যুক্ত মসজিদ নির্মাণে ভারতীয় অথবা বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের বিকশিত কিংবা বিবর্তিতরূপ হিসেবে মনে করা হলেও মূলত বাংলার ঐতিহ্যবাহী দেশজ রীতিকে নির্দেশ করে। আর দেশীয় বারান্দাযুক্ত কুঁড়েঘরের অনুকরণে এগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি রচনায় বাংলার কারিগরদের যে প্রত্যক্ষ প্রভাবের রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৩.২ বারান্দাযুক্ত তিন গম্বুজ মসজিদ

ভাঙনী মসজিদ (ভূমি নকশা-১১, আলোকচিত্র-১০): রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত আলোচ্য মসজিদ ইট নির্মিত ও চুন-সুরকির পলেস্তারায় আচ্ছাদিত আঠারো শতকের শেষার্ধে অথবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত।[৪১] মসজিদের পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ১৪ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯.২০ মিটার। এর চার কোণায় চারটি গোলাকৃতির বুরুজ রয়েছে এবং প্রতিটি বুরুজ আবার একটি করে গোলাকার আলংকারিক সরু বুরুজ দ্বারা বেষ্টিত। কৌণিক এ বুরুজগুলোর মধ্যভাগেও অধীন সরু বুরুজ বিদ্যমান। কোণস্থিত বুরুজগুলো এবং সরু বুরুজসমূহ বপ্রের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্থিত ও কিউপোলা মণ্ডিত। প্রতিটি কিউপোলার শীর্ষবিন্দুতে আবার কলসাকৃতির শিরোচূড়া বিদ্যমান। নামাজঘরের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণের প্রবেশপথ সম্মুখদিকে প্রলম্বিত। এ অংশের উভয় পার্শ্বে গোলাকার সরু বুরুজ বেষ্টিত। প্রবেশপথগুলো বরাবর অভ্যন্তরভাগের কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির হলেও পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অর্ধ-বৃত্তাকার। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় কেন্দ্রীয় মিহরাবও পশ্চাৎ দিকে অভিক্ষিপ্ত এবং এর উভয় পার্শ্বে দুটি গোলাকার সরু বুরুজ সংযোজিত। পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটির খিলান গর্ভ সাদামাটা হলেও কেন্দ্রীয় মিহরাব বহু খাঁজ খিলান নকশায় সজ্জিত। মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ১০.৮০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৯০ মিটার। নামাজগৃহটি দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সম-বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি গগন সদৃশ কন্দাকৃতির গম্বুজ সমগ্র নামাজগৃহকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। গম্বুজগুলো আবার খিলান এবং প্রবেশপথ ও মিহরাবের খিলানের ওপর সংস্থাপিত। গম্বুজের নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থান আচ্ছাদিতকরণে ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ রীতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। আবার নামাজগৃহের সম্মুখভাগে সংযোজিত বারান্দাটির পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৪ মিটার ও প্রস্থে ১.৯৫ মিটার। বারান্দায় প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে। বারান্দার ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত চারটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির গম্বুজ তিনটি সমান্তরাল খিলানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলোর নিম্নভাগের কোণগুলো ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ পদ্ধতিতে পূর্ণ। এ মসজিদের সকল গম্বুজের ওপরে সূক্ষ্ম পদ্ম নকশা ও কলসযুক্ত শিরোচূড়া এর বহির্দৃশ্যকে সুষমামণ্ডিত করেছে এবং কার্নিশ ও বপ্র সামগ্রিকভাবে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল।

আলোচ্য মসজিদ তিন গম্বুজবিশিষ্ট ও বারান্দা সমন্বয়ে গঠিত। সমগ্র মোগল ভারতীয় স্থাপত্যে এ ধরনের মসজিদের এটিই একমাত্র জ্ঞাত উদাহরণ। এ যুগে নির্মিত উপর্যুক্ত তিন গম্বুজ রীতির মসজিদ সচরাচর দেখা গেলেও বর্তমান মসজিদের সম্মুখে বারান্দার সংযোজন বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে এক নতুন অভিযোজন। মোগল আমলে নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ অথবা চালাছাদ সংবলিত বারান্দা সংযোজিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ সংবলিত বারান্দার সংযোজন মধ্যযুগীয় বাংলার স্থাপত্যে একটি ব্যত্যয়ধর্মী উদাহরণ। সম্মুখে বারান্দা সংবলিত এক গম্বুজ ইমারতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ ও ঢাকার দারা বেগমের সমাধি (সতেরো শতক)।[৪২] কিন্তু সুলতানি বাংলার এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ আচ্ছাদিত বারান্দার নজির পাওয়া যায়, যা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। তবে এ আমলে নির্মিত বহু গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদের সম্মুখে গম্বুজ আচ্ছাদিত বারান্দার সংযোজন বাংলার স্থাপত্যের কতিপয় বিদ্যমান উদাহরণ হলো গৌড়ের দরসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯), গুন্মান্ত মসজিদ (পনেরো-ষোল শতক) ও বড়সোনা মসজিদ (১৫১৯-৩১)।[৪৩] এসব উৎস থেকেই সম্ভবত ভাঙ্গনী মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে বারান্দা নির্মাণের ধারণাটি গৃহীত হয়ে থাকতে পারে। আর সুলতানি বাংলার এরূপ নির্মাণ ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে প্রাচীন বাংলার বহুল প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর, যার সম্মুখে টানা বারান্দা সংযোজিত এবং গ্রাম-বাংলার এ প্রাচীন নির্মাণ ঐতিহ্যের প্রতিফলন অদ্যাবধি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মাটির কিংবা ইটের তৈরি বাংলো বাড়িতে আজও পরিলক্ষিত হয়।

৪ বিবিধ রীতির মসজিদ

৪.১ কেন্দ্রীয় গম্বুজসহ খিলানছাদ বিশিষ্ট মসজিদ

আজিমপুর মসজিদ (ভূমি নকশা-১২): ঢাকার আজিমপুরে অবস্থিত আলোচ্য মসজিদ ১৭৪৬ সালে নির্মিত।[৪৪] মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১১.৫৮ মিটার এবং প্রস্থে ৭.৪১ মিটার। এর নামাজঘরের কেন্দ্রীয় বৃহৎ বর্গাকৃতির 'বে'-টি গতানুগতিক পরিক্রমায় একটি বৃহদাকার কন্দাকৃতির গম্বুজে আচ্ছাদিত, যা গোলাকার পিপার ওপর সংস্থাপিত এবং পার্শ্ববর্তী আয়তাকার 'বে'-বর্গ দুটি সম্পূর্ণরূপে অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ এ মসজিদের আচ্ছাদন প্রকৃতি কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদের সমন্বয়ে গঠিত। অনুরূপভাবে সাতক্ষীরা জেলার আতারৌ মসজিদ (সতেরো শতক), তেতুলিয়া মসজিদ (সতেরো শতক), তালা মসজিদ (সতেরো শতক) এবং নারায়গঞ্জের মোগরাপাড়া মসজিদ (১৭০০-০১) সমগোত্রীয় রীতির অপর চারটি বিদ্যমান উদাহরণ। তবে ভূমি নকশা ও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে তালা মসজিদ আলোচ্য রীতির অন্যান্য উদাহরণের অনুলিপি হলেও আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত চার আক্কিক উদ্‌গত পরিকল্পনা মোগল বাংলার স্থাপত্যের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য, যে বিশেষত্ব বাংলার স্থাপত্যে ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। আলোচ্য বৈশিষ্ট্যটি নিঃসন্দেহে উত্তর ভারতীয় মোগল আদর্শ নকশার মসজিদ যেমন– দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি ও লাহোর জামি মসজিদের চার আক্কিক ইওয়ান পথের ধারণা

থেকে এসেছে বলে অনুমিত হয়। যাহোক এরূপ আচ্ছাদন প্রকৃতির উৎস কোথায়? বলা যেতে পারে উসমানীয় আমলের প্রারম্ভিক আদর্শ নকশার মসজিদের যেমন– ইস্তাম্বুলের সুলতান দ্বিতীয় বাইজিদ ক্যামির (১৫০১-১৫০৬) নামাজঘরের ছাদ নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঢাকার অনুরূপ উদাহরণের যথেষ্ট সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।[৪৫] উসমানীয় স্থাপত্যের এ রীতি খুব সম্ভব আরমেনীয়দের মাধ্যমে বাংলার স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে থাকতে পারে। কেননা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে এ দেশে আগত অনেক আরমেনীয় ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলেছিলেন বলে ইতিহাস পাঠে জানা যায়।[৪৬]

৪.২ কেন্দ্রীয় গম্বুজ সমেত *চৌচালা* মসজিদ

সুজাউদ্দীন মসজিদ: ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার দহপাড়ায় অবস্থিত আলোচ্য মসজিদ ১৭৪৩ সালে (১১৫৬ হিজরি) নবাব সুজাউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত।[৪৭] মসজিদের কোণস্থিত বুরুজসমূহ প্রথাগতভাবে সমান্তরাল বপ্র ছেড়ে ওপরে উত্থিত। ইতঃপূর্বে নির্মিত রাজমহল জুমা মসজিদ ও ঢাকার অন্যান্য উদাহরণের মতোই আলোচ্য মসজিদ আয়তাকার পরিকল্পনায় গঠিত এবং এর অভ্যন্তরভাগ তিনটি ‘বে’-বর্গে বিভক্ত। কিন্তু ঢাকা ও রাজমহল মসজিদের সকল ‘বে’-বর্গ একটি করে গম্বুজে আচ্ছাদিত হলেও আলোচ্য উদাহরণের কেবল মধ্যবর্তী ‘বে’-টি গম্বুজাবৃত এবং পার্শ্ববর্তী ‘বে’-বর্গ দুটি *চৌচালা* খিলানছাদে আচ্ছাদিত। অর্থাৎ তিন ‘বে’ বিশিষ্ট আলোচ্য মসজিদের ছাদ গম্বুজ ও *চৌচালা* খিলানছাদে আবৃত এবং রীতিটি বাংলার স্থাপত্যে সম্ভবত বর্তমান উদাহরণের মাধ্যমেই প্রথম আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ আলোচ্য মসজিদ মোগল বৈশিষ্ট্য সংবলিত তিন ‘বে’ বিশিষ্ট হলেও আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে বাংলার স্থাপত্যে এক নতুন রীতির সূচনা করেছে। বলা যেতে পারে মসজিদ স্থাপত্যে গম্বুজ ও খিলানছাদের সমন্বয়ে নামাজঘর আচ্ছাদন রীতিটি বাংলার স্থাপত্যে একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ এবং মোগল বাংলার স্থপতিদের এক অভিনব উদ্ভাবন। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দৈশিক ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গঠিত আলোচ্য মসজিদ বাংলার শিল্পকলার ইতিহাসে এক অনন্য বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। মুর্শিদাবাদের গোলাপবাগ মসজিদ (আঠারো শতক) ও বর্তমান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার যদুনগর মসজিদ (আঠারো শতক) একই রীতির অপর দুটি অনন্য উদাহরণ (ভূমি নকশা-১৩)।[৪৮] তাছাড়া উল্লিখিত মসজিদই সম্ভবত বাংলার স্থাপত্যের প্রথম উদাহরণ, যেখানে পশ্চাৎ দেয়ালে মিহরাবের প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং ফাসাদের খিলানপথ শীর্ষ পলেস্তারায়কৃত *চৌচালা* ও *দোচালা* অলংকরণ বিষয়বস্তু দ্বারা সজ্জিত।[৪৯] এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তীতে মুর্শিদাবাদের মসজিদ স্থাপত্যে উপর্যুপরি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

৪.৩ সমতল ছাদ বিশিষ্ট মসজিদ

ফারুক শিয়ার মসজিদ: সুবাদার আজিম উস-শানের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায় আগত যুবরাজ ফারুক শিয়ার কর্তৃক আলোচ্য মসজিদটি ১৭০৩-০৬ সালে নির্মিত।[৫০] বর্তমানে মসজিদটি

লালবাগ শাহী মসজিদ হিসেবে সমধিক পরিচিত। মোগল বাংলার কয়েকটি বৃহদাকৃতির মসজিদের মধ্যে আলোচ্য মসজিদ অন্যতম, যার পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৫০ মিটার ও প্রস্থে ১৭ মিটার। ভূমি পরিকল্পনা ও ছাদ নির্মাণ কৌশলের কারণে মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বলাবাহুল্য তিন গলিপথ বিশিষ্ট এ মসজিদের নামাজঘর মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে প্রথম ও শেষ জ্ঞাত উদাহরণ। কিন্তু সুলতানি বাংলায় এ রীতির অসংখ্য উদাহরণ অদ্যাবধি বিদ্যমান। সুতরাং ফারুক শিয়ার মসজিদের তিন গলিপথ বিশিষ্ট নামাজঘরের ধারণা সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণ দ্বারাই প্রভাবিত বলে অনুমিত হয়। সুলতানি আমলে নির্মিত গৌড়ের দরসবাড়ি মসজিদ ও ছোটসোনা মসজিদ, নওগাঁ জেলার মাহীসন্তোস মসজিদ, বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় মসজিদ প্রভৃতি তিন গলিপথ বিশিষ্ট মসজিদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া আলোচ্য মসজিদ সমতল ছাদে আচ্ছাদিত, যা বাংলার স্থাপত্যে একটি নতুন বিশেষত্ব। বৈশিষ্ট্যটি সম্ভবত উত্তর ভারতের ফতেপুর-সিক্রিস্থিত নাগিনা মসজিদের অনুরূপ উদাহরণ থেকে অনুকৃত হয়ে থাকতে পারে।[৫১]

৪.৪ বাংলা রীতির মসজিদ

চুরিহাট্টা ও আরমানিটোলা মসজিদ (ভূমি নকশা-১৪): ঢাকার চকবাজার মসজিদ থেকে পশ্চিমে অবস্থিত চুরিহাট্টা মসজিদ ১৬৫০ সালে (১০৬০ হিজরি) এবং আরমানিটোলা মসজিদ ১৭১৬ সালে (১১২৯ হিজরি) নির্মিত।[৫২] উভয় মসজিদই বাংলা-রীতির মসজিদের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মসজিদ দুটি আয়তাকার পরিল্পনায় রচিত এবং সম-আয়তন বিশিষ্ট। অর্থাৎ উভয় মসজিদের বহিস্থ পরিমাপ ৫.৪৮ × ৩.০৫ মিটার। মসজিদদ্বয় একটি মাত্র *চৌচালা* খিলানছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। আরমানিটোলা ও চুরিহাট্টা মসজিদ দুটি সুলতানি বাংলার স্থাপত্যে এ রীতির উদাহরণ বাগেরহাটের সাহেবডাঙ্গা মসজিদের (ষোল শতক) প্রভাবে নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।[৫৩] তাছাড়া উভয় মসজিদ ইটে তৈরি ও পলেস্তারায় আবৃত। নামাজঘরের সম্মুখে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা বড় এবং অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত। আরমানিটোলা মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে একটি মাত্র অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির মিহরাব এবং মিহরাবটি কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে অভিক্ষিপ্ত। অথচ চুরিহাট্টা মসজিদের কিবলা দেয়ালে রয়েছে তিনটি মিহরাব, যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাব অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির হলেও উভয় পার্শ্বের মিহরাব দুটি আয়তাকার পরিকল্পনায় গঠিত। উল্লেখ্য যে, প্রথমোক্ত মসজিদে কোণস্থিত বুরুজ থাকলেও শেষোক্ত মসজিদে তা অনুপস্থিত।

চৌচালা খিলানছাদের ব্যবহার সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের *চৌচালা* ছাদের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় নওগাঁ জেলার ধামইরহাটের মাহীসন্তোষ মসজিদ (১৪৬৩), বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, গৌড়ের লট্টন মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), ছোটসোনা মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ ও বগুড়ার মহাস্থানগড় মসজিদে (পনেরো শতক)। তাছাড়া মোগল আমলে নির্মিত ঢাকার বড় কাটরা (১৬৪৪-১৬৪৬), ছোট কাটরা (১৬৬৩) ও

পুরানা পল্টন মসজিদ অনুরূপ *চৌচালা* ছাদে আচ্ছাদিত। বাংলার এ স্থানীয় নির্মাণরীতি পরবর্তীতে সম্রাট শাহাজাহানের আমলে নির্মিত আগ্রা দুর্গের জাহানারা প্রাসাদ (১৬৩৭), দিল্লির লালকেল্লাস্থ (১৬৩৯-১৬৪৮) দিওয়ান-ই-আমের সিংহাসন কক্ষ, লাহোর দুর্গের নওলাখি প্যাভিলিয়ন (১৬৪০), দাক্ষিণাত্যের বন্দেনেওয়াজ দরগাহ (১৬৪০) এমনকি আঠারো শতকে নির্মিত রাজপুত ইমারতে পরিদৃষ্ট হয়।[৫৪] বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের এ অভিনব *চৌচালা* ছাদ নির্মাণ কৌশলটি মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দির স্থাপত্যেও অনুসৃত হয়েছে। পাবনার কপিলেশ্বর শিবমন্দির (১৬৩৫), মাগুরার শিবমন্দির (১৭৩৩), পুঠিয়ার শিবমন্দির (আঠারো শতক) প্রভৃতি উল্লিখিত পদ্ধতির চলমানরূপ।[৫৫] তবে এসব মন্দিরের উপরিস্থিত *চৌচালা* ছাদ কিছুটা পিরামিড আকৃতির। মধ্যযুগীয় বাংলার মসজিদ ও মন্দির স্থাপত্যে এরূপ *চৌচালা* খিলানছাদ পরিদৃষ্ট হলেও প্রাচীন বাংলার হিন্দু-বৌদ্ধ স্থাপত্যে এ রীতির প্রচলন আদৌ ছিল কি-না তার কোনো নজির পাওয়া যায় না। সুতরাং বিদ্যমান জ্ঞাত উদাহরণের অভাবে ধারণা করা যায় যে, এ ধরনের নির্মাণরীতি স্থানীয় কুঁড়েঘরের চালাছাদের অনুকরণে মুসলমানরাই প্রথম স্বীয় ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করে, যা পরবর্তীকালে বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। বলতে দ্বিধা নেই যে, দেশীয় কুঁড়েঘর সদৃশ বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে *চৌচালা* খিলানছাদের ব্যবহার এদেশের কারিগরদের অনন্য অবদানের ফসল এবং বাঙালিকরণের এক অভিনব প্রচেষ্টা।

৪.৫ নলাকৃতির খিলানছাদ বিশিষ্ট মসজিদ

মালদহ জামি (আলোকচিত্র-১১): পুরাতন মালদহ শহরের দক্ষিণাংশে আলোচ্য জামি মসজিদ অবস্থিত এবং জনৈক মাসুম কর্তৃক ১৫৯৬ সালে (১০০৪ হিজরি) নির্মিত।[৫৬] ভূমি নকশা অনুযায়ী মসজিদটি উত্তর ভারতে বিকশিত মোগল উদাহরণের অনুরূপ বলেই প্রতীয়মান হয়। অষ্টভুজাকৃতির কোণস্থিত বুরুজ দ্বার সুরক্ষিত আলোচ্য মসজিদের বাহ্যিক পরিমাপ ২২ × ৮ মিটার। মসজিদের নামাজঘর একটি প্রশস্ত গলিপথ দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত এবং কেন্দ্রীয় গলিপথ নলাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত। তবে উভয় পার্শ্বের 'বে'-বর্গ মোগল রীতির কন্দাকৃতির গম্বুজে আবৃত। অর্থাৎ আচ্ছাদন প্রকৃতির দিক থেকে মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যে বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। গলিপথ দ্বারা নামাজঘরকে দ্বিখণ্ডিতকরণ রীতি অর্থাৎ ভূমি নকশা বিবেচনায় মসজিদটি গৌড়ের আদিনা মসজিদ, ছোটসোনা মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ, ষাটগম্বুজ মসজিদ, মাহীসন্তোষ মসজিদ, মহাস্থানগড় মসজিদ ও গুন্মান্ত মসজিদের অনুলিপি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে ছাদ নির্মাণরীতি অনুযায়ী বর্ণিত মসজিদ গৌড়ের আদিনা মসজিদ ও গুন্মান্ত মসজিদের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[৫৭] আলোচ্য নির্মাণ ঐতিহ্য (ভূমি নকশার দিক থেকে) দিল্লির বেগমপুরী মসজিদের (চৌদ্দ শতক) প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফসল হিসেবে ধরে নেয়া যায়। নামাজঘরকে প্রশস্ত গলিপথ দ্বারা সমবিভাজন ঐতিহ্য মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে উমাইয়া আমলে নির্মিত দামেস্ক জামি মসজিদে (৭০৫-১৫) সর্বপ্রথম

পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে রীতিটি আব্বাসীয় আমলে ও পারসিক ভূখণ্ডে নির্মিত যথাক্রমে বাগদাদ মসজিদ (৭৬২), রাক্কা মসজিদ (৭৭২), সামাররা মসজিদ (৮৪৭), আবু দুলাফ মসজিদ (৮৫৯), বিবি খানম মসজিদ (১৩৯৯), মসজিদ-ই-শাহ (১৬১২-১৬৩৭), শেখ লুৎফুল্লাহ জামি (১৬১৭) এমনকি ইস্পাহান জামি মসজিদে (আট-সতেরো শতক) ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে।[৫৮] বলাবাহুল্য মুসলিম স্থাপত্যে নামাজঘরকে নলাকৃতির খিলানছাদ ও গম্বুজ দ্বারা আবৃতকরণ রীতির সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো আট শতকে নির্মিত পারস্যের দামগান *তারিখখানা* মসজিদ (ঈশ্বরের ঘর) ও নাইরিজ মসজিদ (নয় শতক)।[৫৯] বাংলার স্থাপত্যে ব্যবহৃত নলাকৃতির খিলানছাদের উৎপত্তি কোথায় তা নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে, এর স্থাপত্যিক উৎস বাংলাতেই, আবার অনেকেই বহির্বিশ্বের প্রাক-মুসলিম কিংবা মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। অর্থাৎ দানীর ভাষায়, নলাকৃতির খিলানছাদের নুমনা-আদর্শ একদা বাংলার নদ-নদীতে চলমান নৌকার ছই আকৃতির চালাছাদের প্রতিরূপ হতে পারে।[৬০] কিন্তু *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা*র সূত্র মতে, নলাকৃতির গঠনশৈলী প্রথম পরিলক্ষিত হয় প্রাচীন মিশর ও নিকট-প্রাচ্যে।[৬১] আবার কেউ কেউ পারস্যের গজনভী ও সেলযুক স্থাপত্যে এ রীতির বীজ রোপিত হয়েছিল বলে মনে করে থাকেন। যাহোক আলোচ্য মসজিদের গম্বুজ শীর্ষ মোগল রীতির পদ্মফুল আকৃতির শীর্ষদণ্ডে সজ্জিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের সম্মুখাংশে সরু বুরুজ বেষ্টিত একটি *পিসতাক* বিদ্যমান এবং পার্শ্ববর্তী অংশদ্বয়ের কার্নিশ বক্রভাবে রচিত। আলোচ্য মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে পিসতাকের সংযোজন বাংলার স্থাপত্যে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে প্রথম পরিলক্ষিত হয় এবং দিল্লির কিলা-ই-কুহনা মসজিদ (১৫৪৫) ও জৌনপুর জামি মসজিদ (১৪৭০) আলোচ্য রীতির অনুপ্রেরণার একমাত্র উৎস হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।[৬২] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের আঞ্চলিক পর্যায়ে জৌনপুরের পাশাপাশি গুজরাটের মসজিদ স্থাপত্যে বর্ণিত শৈলী যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।[৬৩] মসজিদটি সামগ্রিকভাবে পলেস্তারায় অলংকৃত – যে পলেস্তারার আস্তরণ পরবর্তী মোগল বাংলার স্থাপত্যের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত। আলোচ্য মসজিদের কতিপয় নির্মাণ বৈশিষ্ট্য যেমন–পলেস্তারার আস্তরণ, কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ অভিক্ষিপ্তপূর্বক আলংকারিক সরু বুরুজ দ্বারা বেষ্টিতকরণ এবং গম্বুজশীর্ষে পদ্ম ও কলস শীর্ষদণ্ডে সজ্জিতকরণ– পরবর্তীকালে মোগল বাংলার স্থাপত্যের গঠন ও বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

রাজমহল মসজিদ (আলোকচিত্র-১২): বর্তমান রাজমহল শহরের ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে মসজিদটি অবস্থিত এবং সম্রাট আকবরের পূর্বাঞ্চলীয় ভাইসরয়-জেনারেল রাজা মানসিংহ কর্তৃক ১৫৯৫-৯৬ সালে নির্মিত।[৬৪] মসজিদের আয়তাকার নামাজঘরের পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৬৭ মিটার ও প্রস্থে ২০ মিটার। নামাজঘরের প্রতিটি কোণ অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এবং বুরুজসমূহ সমান্তরাল ছাদ কিনারা অতিক্রমপূর্বক ওপরে উত্থিত ও শীর্ষদেশ কিউপোলায় সুশোভিত। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে সাতটি বৃহদাকৃতির চতুষ্কেন্দ্রিক খিলানপথ বিদ্যমান এবং

মধ্যবর্তী প্রবেশপথটি সম্মুখদিকে উদগতপূর্বক উঁচু খিলান সংবলিত *পিসতাক*-এ সমৃদ্ধ। এর উভয় পার্শ্বে আলংকারিক সরু বুরুজ বেষ্টিত। মসজিদের সমান্তরাল বপ্র মোগল স্থাপত্যের চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃত *কানজুরা* নকশায় সজ্জিত। এর নামাজঘর একটি প্রশস্ত গলিপথ দ্বারা দুটি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশ আবার উত্তর-দক্ষিণে ধাবমান দুটি গলিপথ এবং পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান দুটি 'বে'-বর্গের সমন্বয়ে গঠিত। অর্থাৎ মসজিদের উভয় পার্শ্বের প্রতিটি অংশ চারটি করে মোট আটটি 'বে'-বর্গে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় প্রশস্ত গলিপথ নলাকৃতির খিলানছাদে আচ্ছাদিত হলেও উভয় পার্শ্বের প্রতিটি 'বে'-বর্গ গম্বুজাবৃত। গম্বুজ নির্মাণে অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিকোণাকার পান্দানতিফ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদের অভ্যন্তরের সর্বোত্তরে ও সর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত চারটি স্বতন্ত্র দ্বিতল বিশিষ্ট কক্ষ পরিলক্ষিত হয়, যা বাংলার স্থাপত্যে আলোচ্য মসজিদের পূর্বাপরে আর দেখা যায় না। নামাজঘরের উভয় প্রান্তস্থিত দ্বিতল কক্ষ বিন্যাস ও ইওয়ান-ই-প্রবেশপথ, চতুষ্কেন্দ্রিক খিলান, সমান্তরাল বপ্র, অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতি মিহরাব *কুলঙ্গি*, পলেস্তারার আস্তরণ প্রভৃতি বিশেষত্বে রাজমহল জামি মসজিদ সম্রাট আকবরের ফতেপুর-সিক্রি জামির (১৫৭১) সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।[৬৫]

উপসংহার

শিল্পকলা একটি দেশ-জাতির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহের প্রতিচ্ছবি। সুকুমার শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা স্থাপত্যকলা মূলত দেশ-জাতির অর্থনৈতিক ও শিল্পসত্তার মানোন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মানব সভ্যতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণয়নে পুরাকীর্তির ভূমিকা অপরিসীম। কেননা স্থাপত্যশিল্প ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস। বলাবাহুল্য যে কোনো দেশ-জাতির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বস্তুত সমসাময়িক গ্রন্থনির্ভর হওয়ায় সাধারণ্যের নিকট তা অনেকটাই আড়ালে থেকে যায় এবং প্রণেতার স্বীয় মননের ছাপ কমবেশি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্থাপত্য-ঐতিহ্যের ইতিহাস জীবন্ত, যা সবার সামনে সমরূপে দৃশ্যমান। মধ্যএশিয়া ও পারসিক বংশোদ্ভূত মোঙ্গল-তৈমুরীয় হওয়ায় জাতিগতভাবে আলাদা সত্তার বলয়ে সমগোত্রীয় উত্তর ভারতীয় মোগল শাসকদের বিশ্বস্ত-অনুগত কর্মচারী হিসেবে বাংলার সুবাদার এবং নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে এ দেশে গড়ে ওঠা স্থাপত্যিক ঐতিহ্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় মসজিদ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষণীয়। এ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্য এক নতুন ধারায় রূপান্তরিত হয়, যে ধারা ইতঃপূর্বে বিকশিত সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্য থেকে বহুলাংশেই ভিন্নতর। অর্থাৎ এ পরিবর্তন শুধু মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং অলংকরণের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে দৃশ্যমান। তবে সমকালীন স্থাপত্যের ইতিহাসে মূল্যমান বিচারে সুলতানি বাংলার অনুরূপ উদাহরণের তুলনায় অনেকটাই সাদাসিধে ও নিরাভরণ। তাছাড়া এ নতুন ধারায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রাক-মোগল বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের চিরাচরিত উল্টানো *চাঁড়ি* সদৃশ গম্বুজ ও দেশীয় *চৌচালা* খিলানছাদের স্থলে এ যুগের মসজিদ স্থাপত্য ভিন্নরূপে আচ্ছাদিত হতে থাকে এবং সে

আচ্ছাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ বাংলার মোগল মসজিদসমূহের ছাদ নির্মাণে কন্দাকৃতির গম্বুজ, অর্ধ-গম্বুজাকৃতির খিলানছাদ, সমতল ছাদ, ক্রুশাকৃতির খিলানছাদ, নলাকৃতির খিলানছাদ এবং *চৌচালা* খিলানছাদ ব্যবহৃত হয়েছে, বর্ণিত সমীক্ষণ থেকে বিষয়টি স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায়। আর ছাদ নির্মাণ কৌশল হিসেবে কর্বেল কিংবা ত্রিকোণাকৃতির পান্দানতিফ এবং স্কুইঞ্চ খিলানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যাহোক এ ভিন্নতায় পারসিক প্রভাবান্বিত উত্তর ভারতীয় মুসলিম বিশেষ করে মোগল রাজকীয় স্থাপত্যের প্রাধান্য সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ভারতীয় তথা বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রভাবের অন্যতম কারণ হলো অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বাংলায় আগত মুসলিম শাসক ও কারিগরগণ মূলত উত্তর ভারতীয় হওয়ায় তাদের নির্মিত ইমারতে উত্তর ভারতের তথা বহির্দেশীয় স্থাপত্যরীতির প্রভাব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হবে এটিই স্বাভাবিক। তবে বাংলার মোগল স্থাপত্যের পরিপূর্ণতা অর্জনে এ দেশের সুলতানি স্থাপত্যরীতির অবদানকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। বরং মোগল বাংলার সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে দুটি ধারা লক্ষণীয় – একটি সুলতানি এবং অপরটি উত্তর ভারতীয় মুসলিম। এ কথা স্মর্তব্য যে, প্রাক-মোগল স্থানীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রভাব তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ নগরাঞ্চলে নির্মিত ইমারতসমূহে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হলেও ঢাকাসহ অপরাপর রাজধানী শহরাঞ্চলে উত্তর ভারতীয় নির্মাণশৈলীর প্রাধান্য সর্বাধিক দৃশ্যমান। এর সফল ও সার্থক প্রতিফলন লক্ষিত হয় মোগল বাংলার নির্মাণশিল্পের ইতিহাসে – যে নির্মাণশিল্প সর্ব যুগে যে কোনো দেশ-জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

ভূমি নকশা

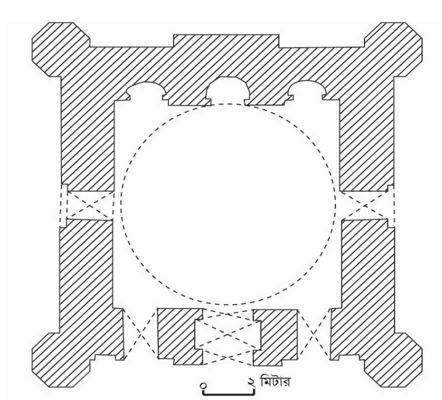

ভূমি নকশা-১: বিবি মসজিদ, বগুড়া।

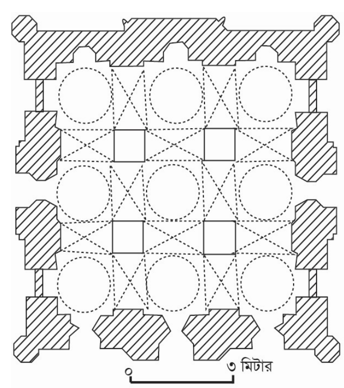

ভূমি নকশা-২: লালদীঘি মসজিদ, রংপুর।

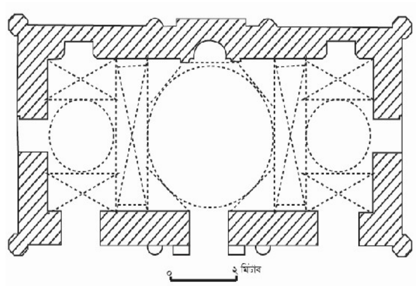

ভূমি নকশা-৩: ইসলাম খান মসজিদ, ঢাকা।

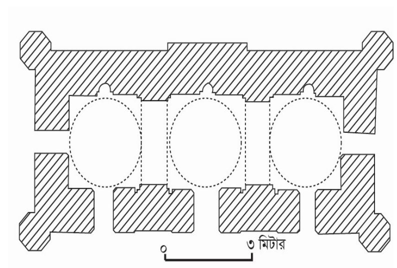

ভূমি নকশা-৪: খেরুয়া মসজিদ, বগুড়া।

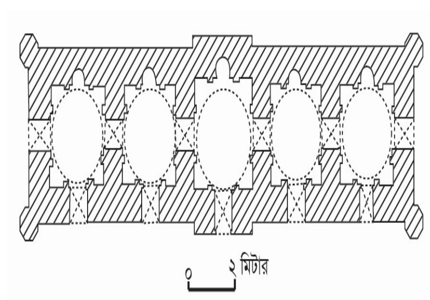

ভূমি নকশা-৫: টেঙ্গা মসজিদ, সাতক্ষীরা।

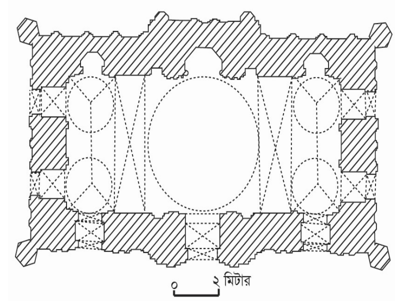

ভূমি নকশা-৬: সরাইল মসজিদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

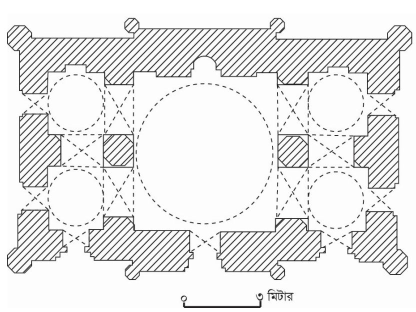

ভূমি নকশা-৭: ওয়ালীপুর আলমগীর মসজিদ, চাঁদপুর।

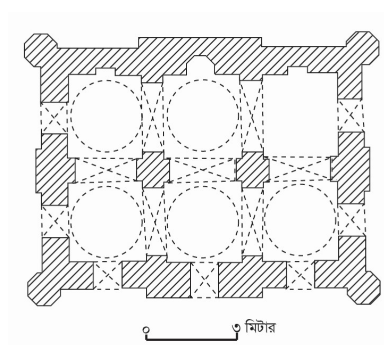

ভূমি নকশা-৮: মোল্লা মিসকিন মসজিদ, চট্টগ্রাম।

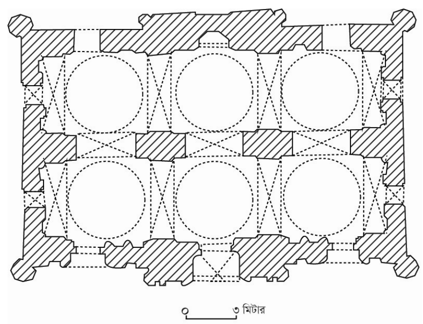

ভূমি নকশা-৯: ওয়ালীখান মসজিদ, চট্টগ্রাম।

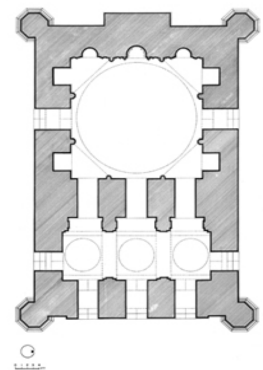

ভূমি-নকশা ১০: আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল।

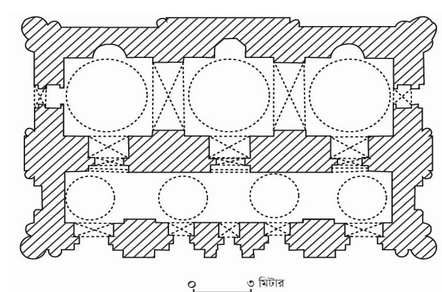

ভূমি-নকশা ১১: ভাঙ্গনী মসজিদ, রংপুর।

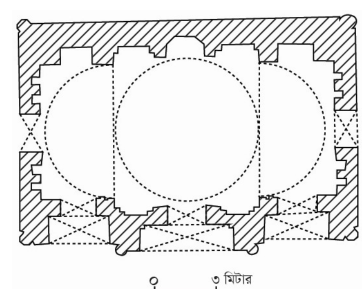

ভূমি নকশা-১২: আজিমপুর মসজিদ, ঢাকা।

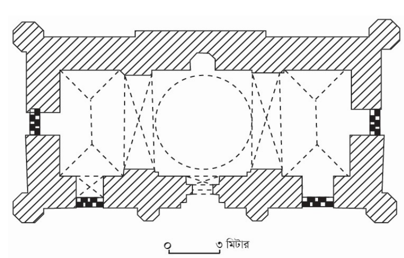

ভূমি নকশা-১৩: যদুনগর মসজিদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

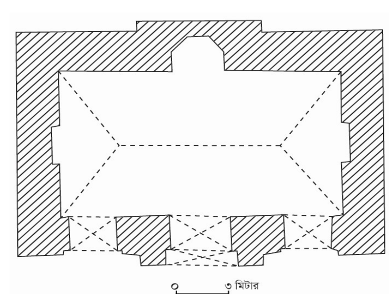

ভূমি নকশা-১৪: আরমানিটোলা মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র

আলোকচিত্র-১: সাদীর মসজিদ, এগারসিন্ধুর, কিশোরগঞ্জ।

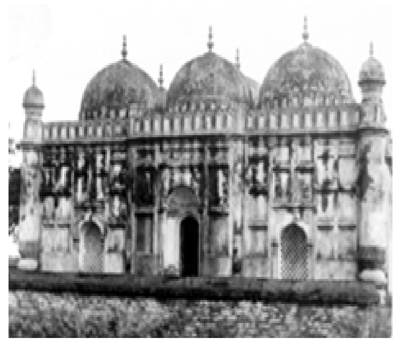

আলোকচিত্র-২: লালদীঘি মসজিদ, বদরগঞ্জ, রংপুর।

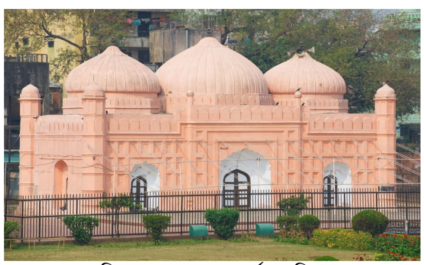

আলোকচিত্র-৩: লালবাগ দুর্গ মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র-৪: সাতগম্বুজ মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র-৫: খেরুয়া মসজিদ, শেরপুর, বগুড়া।

আলোকচিত্র-৬: করতলব খান মসজিদ, ঢাকা।

আলোকচিত্র-৭: ওয়ালীখান মসজিদ, চট্টগ্রাম।

আলোকচিত্র-৮: কুতুবশাহী মসজিদ, মালদহ।

আলোকচিত্র-৯: আতিয়া মসজিদ, টাঙ্গাইল।

আলোকচিত্র-১০: ভাঙ্গনী মসজিদ, মিঠাপুকুর, রংপুর।

আলোকচিত্র-১১: মালদহ মসজিদ, মুর্শিদাবাদ।

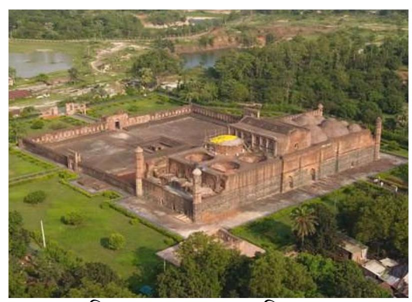
আলোকচিত্র-১২: রাজমহল মসজিদ, রাজমহল।

তথ্যনির্দেশ

১ ১৫৩৮ সালে সম্রাট হুমায়ূন বাংলার সমকালীন শাসক শেরখানকে পরাজিত করে রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। অতঃপর তিনি জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে (১৫৩৮-১৫৩৯) বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করে গৌড়ের নামকরণ করেছিলেন জান্নাতাবাদ (স্বর্গীয় শহর)। দেখুন: Ghulam Hussain Salim, *Riyazu-s-Salatin* (Eng. Translation), (Delhi: Idarahi Adabiyati, 1975), p. 142; Abul Fazal, *Akbarnama* (Eng. tran), vol. 1 (Calcutta: Asiatic Society, 1992), p. 34; C. Stewart, *History of Bengal* (Calcutta: The Bangabasi Office, 1910), p. 147

২ A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961) p. 176, fig-16; A. B. M. Hussian (ed.), *Architecture : A Cultural Survey Series*-2 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2012), p. 266

৩ G. Michell (ed.), *The Islamic Heritage of Bengal* (Paris: UNESCO, 1984), pp. 41 & 113

৪ M. A. Bari, *Khalifatabad : A Study of Its History and Monuments* (Mphil. Thesis, Rajshahi University, 1980), p. 89; A. U. Pope, *Persian Architecture* (New York: George Braziller, 1965), p. 71; Andre Godard, *The Art of Iran* (London: George Allen & Unwin Ltd, 1965), p. 183, fig-157 & 167; Barbara Brend, *Islamic Art* (London: British Museum Press, 1991), p. 73

৫ S. M. Hasan, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal* (Dacca: University Press Ltd., 1979), p. 177; মোহাম্মদ শামসুল হক, "ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অবস্থান", *আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১), পৃ. ২৯৪।

৬ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, pp. 170 & 174 (according to the ground plan).

৭ A. H. Dani, *op. cit.*, p.177; *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, June,1885, p. 105.

৮ Sirajul Islam (ed.), *Banglapedia*, vol. 2 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2003), p. 67.

৯ M. A. Bari, *Mughal Mosque Types in Bangladesh : Origin and Development* (PhD Thesis, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1989), pp. 348-50

১০ W. Haig (ed.), *The Cambridge History of India*, vol. III (Delhi: Chand & Co. 1958), pp. 592-93; P. Brown, *Indian Architecture (Islamic Period)*, (Bombay: Taraporevala Sons & Co. Ltd., 1975), p. 24. pl. XI, no.1; R. Nath, *History of Sultanate Architecture* (New Delhi: Abhinav Publications, 1978), p. 70, fig-37

১১ M. A. Bari, *op. cit.*, pp. 351 & 352; A. Papadopoulo, *Islam and Muslim Art* (London: Thames & Hudson, 1980), pp. 263-64, fig-903; S. M. Hasan, *op. cit.*, p. 43, fn-21

১২ D. Hill, *Islamic Architecture in North Africa* (London: Faber & Faber Ltd., 1976), p. 100; O. Aslanapa, *Turkish Art and Architecture* (London: Faber & Faber Ltd., 1971), pp. 114-15; K. A. C. Creswell, *The Muslim Architecture in Egypt*, vol. 1 (Oxford: The Clarendon Press, 1951), pp. 11-15

১৩ A. Papadopoulo, *op. cit.*, pp. 263-64 & 504, fig-1114; B. Unsal, *Turkish Islamic Architecture* (London: Alec Tiranti, 1959), pp. 20-21, fig-4(b); A. Kuran, *The Mosque in Early Ottoman Architecture* (Chicago: University Press, 1968), p. 154, fig-167; O. Aslanapa, *op. cit.*, p. 544

১৪ P. Brown, *op. cit.*, pl. 86, fig-1 & 2; R. Nath, *op. cit.*, p. 109; S. Grover, *Architecture of India : Islamic* (727-1707), (New Delhi: Vikas Publishing House, 1981), p. 146, fig-6.09.

১৫ Andre Godard, *p. cit.*, p. 285

১৬ *Banglapedia*, vol. 7, p. 385

১৭ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 142, fig-15; p. 204, fig-44; p. 224, fig-50

১৮ G. Michell (ed.), *Architecture of the Islamic World* (London: Thames & Hudson, 1978), p. 269; P. Brown, *op. cit.*, p. 30

১৯ Samsuddin Ahmed, *Inscriptions of Bengal,* vol. IV (Rajshahi: Varendra Research Society, 1960), pp. 259-60
২০ *Architecture : Series*-2, p. 266
২১ Samsuddin Ahmed, *op. cit.*, pp. 261-66; Abul Fazal, *Ain-i-Akbari*, vol. I (Eng. Tr. by H. Blochman), (Calcutta: Royal Asiatic Society, 1873), p. 621; *Epigraphia Indo-Muslemica*, 1937-38, p. 19; *Epigraphia Indica*, vol. II, pp. 288-89; *Protected Monuments and Mounds of Bangladesh* (Dacca: Department of Archaeology, 1975), p. 1. তুর্কিদের প্রদেয় ঘোড়াঘাট অঞ্চলের জায়গীরদারদের উপাধি ছিল কাকশাল।
২২ R. E. M. Wheeler, *Five Thousand Year of Pakistan* (London: Royal India and Pakistan Society, 1950), p. 127
২৩ *Architecture : Series*-2, p. 248
২৪ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 163
২৫ *Architecture : Series*-2, p. 267
২৬ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 113
২৭ A. H. Dani, *Dacca : A Record of Its Changing Fortunes* (Dacca: Mrs. S. S. Dani, 1962), pp. 101-02
২৮ M. A. Bari, *op. cit.*, p. Appendix-B, p. 367
২৯ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p.39; *Banglapedia*, vol. 12, p. 409
৩০ C. Stephen, *Archaeology and Monumental Remains of Delhi* (Allahabad: Kitab Mahal, 1967), pp. 111-12; R. Nath, *op. cit*, pp. 49, 89
৩১ Perween Hasan, *Sultans and Mosques* (London: I.B. TAURIS, 2007), p. 201
৩২ A. Husain, 'Alamgir Mosque at Walipur', *The Concept of Pakistan*, November, 1965, pp. 26-27
৩৩ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 91
৩৪ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 128
৩৫ C. Stephen, *op. cit.*, pp. 111-12; মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলের মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ* (রাজশাহী: প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রা.বি, ১৯৯৬), পৃ. ৭৯, রেখাচিত্র-১৯; *Architecture : Series*-2, p. 294; G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 39
৩৬ *Banglapedia,* vol. 14, p. 383
৩৭ M. A. Bari, *op. cit.*, p. 110
৩৮ A. H. Dani, *op. cit.,* p.169
৩৯ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage, op. cit.*, p. 40; *Bangladesh Archaeology,* vol. I (Dacca: Department of Archaeology & Museums, 1979), p. 103
৪০ Sultan Ahmad, *Archaeology of the Muslim Towns of Gujrat* (Phd Thesis, M.S. University of Boroda, 1982), pp. 140-43, pl. 4.32; A. B. M. Husain, "Mosque Plan - An Outline History", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* vol. VI, Rajshahi, 1982-83, p. 9; M. A. Bari, *op. cit.*, p. 77; G. Goodwin, *A History of Ottoman Architecture* (London: Thames & Hudson, 1971), p. 56 (according to the ground plan).
৪১ এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *সরকার ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও স্থাপত্যকীর্তি* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২৩), পৃ. ২৩৪
৪২ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 40; A. H. Dani, *op. cit.*, pp. 210-12
৪৩ A. B. M. Husain (ed.), *Gawr-Lakhnawti* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), pp. 67-75
৪৪ এম. আর. আলী তাইস, *তারিখ-ই-ঢাকা* (বাংলা অনূদিত), (ঢাকা, ১৯৮৫), পৃ. ২২৬-২৭
৪৫ O. Aslanapa, *op. cit.*, pp. 213-15, plan-45; G. Goodwin, *op. cit.*, p. 169, plan-163

৪৬ M. Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal,* vol. IB (Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 2003), p. 770

৪৭ *Banglapedia*, vol. 13, p. 191

৪৮ M. A. Bari, *op. cit.*, pp. 284-85

৪৯ *Architecture : Series*-2, p. 294

৫০ S. A. Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca* (Dacca: University Press Ltd., 1904), p. 11.

৫১ A. B. M. Husain, *Fathpur-Sikri and Its Architecture* (Dacca: Bureau of National Reconstruction, 1970), p.92

৫২ S. A. Hasan, *Antiquities of Dacca*, *op. cit.*, pp. 30-32; M. A. Karim, 'Some Inscriptions of Dacca', *Journal of the Asiatic Society of Pakistan*, vol. XII, 1967, pp. 296-99

৫৩ M. A. Bari, *Khalifatabad*, *op. cit.*, pp. 218-21

৫৪ O. Aslanapa, *op. cit.*, p. 464; A. H. Dani, *op. cit.*, p. 181; S. M. Hasan, *op. cit.*, p. 179; Barbara Brend, *Islamic Art* (London: British Museum Press, 1991), p. 209; P. Brown, *op. cit.*, pl. LI

৫৫ কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মন্দির স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ : একটি সমীক্ষা", *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাডিজ*, খণ্ড ৩১, ২০০৩, পৃ. ১৮৫

৫৬ *Architecture : Series*-2, p. 268

৫৭ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, p. 106

৫৮ এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫২

৫৯ A. U. Pope, *op. cit.*, p. 78; Marks Hattsein (ed.), *Islam : Art and Architecture*, (German: h.f.ullaman publishing GmbH, 2013), pp. 109 & 114; O. Aslanapa, *op. cit.*, pp. 109 & 114

৬০ A. H. Dani, *op. cit.*, p. 15

৬১ *Encyclopedia Brittanica*, vol. 2 (London: William Benton Publisher, 1973), p. 283, fig-6

৬২ G. Michell (ed.), *Islamic Heritage*, *op. cit.*, pp. 106-07

৬৩ Ebba Koch, *Mughal Architecture* (Germany: Prestel-Verlag, 1991), p. 65

৬৪ *Architecture : Series*-2, p. 269

৬৫ A. B. M. Husain, *op. cit.*, p. 104; G. Michell (ed.), *op. cit.*, p. 271